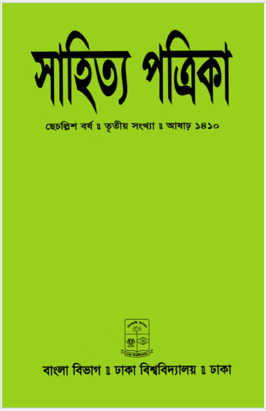

Vol. 46 | No. 3 | 2003

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের শিল্প-বৈশিষ্ট্য

Volume	46
Issue	3
Year	2003
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ
Published online	June 1, 2003
DOI	10.62328/sp.v46i3.332
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i3.332
Pages	৭০-১১৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের শিল্প-বৈশিষ্ট্য

মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ*

অদ্বৈত মল্লবর্মণের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ (১৯৫৬) উপন্যাসে মূলত অন্ত্যজ শ্রেণীর জীবন রূপায়িত হয়েছে। তিতাস নদী-তীরে বসবাসকারী মালোদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা-চিত্রের, সমন্বয়ে তাদের জীবনের সামগ্রিক রূপটি যেন এক বিশাল ক্যানভাসে এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। ফলে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-আচরণ, রুচি-সংস্কৃতি, ধর্মীয় অনুভূতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে স্থান পেয়েছে এ উপন্যাসে। মালোদের জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন তিতাস নদী। তিতাসের সঙ্গে তাদের জীবন সম্পর্কের যে খণ্ড খণ্ড চিত্র তৈরি হয় নিত্য, তারই আলেখ্য এ রচনা। ফলে এ উপন্যাসের কাহিনীও যেমন তিতাসকে নিয়ে আবর্তিত, চরিত্রগুলোর বিকাশও ঘটেছে তেমনই তিতাসকে অবলম্বন করে।

‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসটি চারটি অংশে বিভক্ত। প্রতিটি অংশেরও রয়েছে দুটি করে ভাগ। প্রথম অংশের ভাগ দুটো হলো যথাক্রমে ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ও ‘প্রবাস খণ্ড; এবং এর পর দ্বিতীয় অংশের দু ভাগ হচ্ছে ‘নয়াবসত’ ও ‘জন্ম-মৃত্যু বিবাহ’; তৃতীয় অংশের ভাগ দুটোর নাম ‘রামধনু’ ও ‘রাঙা নাও’ এবং সব শেষ অংশের ভাগ দুটোর নাম ‘দুরঙা প্রজাপতি’ এবং ‘ভাসমান’। চারটি অংশের আটটি ভাগের পরিসরে উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসটির কাহিনী। কোন কোন উপন্যাসে কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে কোন্‌টি প্রধান কোন্‌টি অপ্রধান সেটি নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তবে অনেক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে এ দু উপাদানেরই সমন্বয় ঘটে। ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ উপন্যাসের ক্ষেত্রে উপন্যাস নির্মাণের শর্তাবলি নিখুঁতভাবে পালিত হয়েছে, এমনটি বলা কঠিন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কাহিনী বা চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে আকস্মিকতা উপাদান যত কম ব্যবহার করা যায় ততই উত্তম। টমাস হার্ডির মতো অনেক খ্যাতনামা বাংলা ঔপন্যাসিকই— যেমন বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র— আকস্মিকতা উপাদান বা কাকতাল বারবার ব্যবহার করেছেন। তার ফলে কাহিনী, ঘটনা বা চরিত্রের

★ পিএইচডি, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যাল

বাস্তবতা প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে যায়। তারপরও পাঠকমন অনেক সময় যেন কখনও কখনও প্রস্তুতই থাকে কাকতালের জন্যে। সেটির বিবেচনায় এনে, কোন কোন কাকতালীয় ঘটনা বা অনুষঙ্গ উপন্যাস শিল্পে সহনীয় হিসেবে ধরা হয়। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের বক্তব্য উল্লেখ করা যায় :

> অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম'... এত কাকতাল ব্যবহার করা হয়েছে। এত বেশি কাকতাল আছে, এবং এমনই তাদের রূপ ও বিভঙ্গ যে কাকতাল থেকেই মূল টানাপোড়েনের একটি সাজ, একটা ডিজাইন তৈরি হয়েছে।[১]

'তিতাস একটি নদরি নাম' উপন্যাসে তিতাস তীরের জেলেদের জীবনের নানা স্বপ্ন-সংগ্রাম-ব্যর্থতা অনেকগুলো কাকতালের মাধ্যমে আঁকা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাস থেকে ঘটনার এমন আকস্মিকতা বা কাকতালের উদাহরণ উপস্থাপন করা যেতে পারে[২]:

ক. দলের ভিতর সেই মেয়েটিকেও দেখা গেল। মার পায়ের দিকে তাকাইয়া সেও তালে তালে পা ফেলিতেছিল। কিশোরের সহিত চোখাচুখি হইয়া সে তাল কাটা পড়িল। পা আর উঠিতে চাহিল না। ...অদূরে দাঁড়াইয়া কিশোর তাহাকেই দুই চোখের দৃষ্টি দিয়া যেন গ্রাস করিতেছে।

...ইহারই পটভূমিকায় কিশোর মূর্ছিতা মেয়েটাকে পাঁজা-কোলা করিয়া তুলিয়া ঘন ঘন হাঁকিতে লাগিল, 'এর মা কই, এর মা কই? সে অজ্ঞান হইয়া গেছে। জল আন, পাংখা আন।'

...কিশোরের মনে একটা অস্বাভাবিক আশা জাগিয়াছে। সেই মেয়েটির সঙ্গে তার বিবাহ হইবে। আশাটা আরও অস্বাভাবিক এইজন্য : সে নিজে কাউকে কিছু বলিতে পারিবে না, তাকেই বরং কেউ আসিয়া বলুক। মনে মনে সে কল্পনার রঙ ফলায় : আচ্ছা এমন হয় না, মেয়ে পক্ষ কেউ আসিয়া তাকে বলে, 'ত, কিশোর, এই কন্যা তোমারে দিলাম, লইয়া গিয়া বিয়া কর।

খ. পা টিপিয়া টিপিয়া চলার শব্দ আর চাপা গলার ফিস্‌ফাস্ কথা বলার আওয়াজ প্রথমে তিলকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিল। নাঃ, কিশোরটা বেহায়ার হদ্দ। তাকে নিয়ে আর পারা যাইবে না। বিরক্ত হইয়া তিলক পাশ ফিরিয়া শুইতেছিলো। এমন সময় পায়ে জোরে একটা টান পড়ায়

> তার তন্দ্রা পাতলা হইতে হইতে একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। পুরা সম্বিৎ পাইয়া দেখে, ছইয়ের ভিতরে শুইয়াছিল, তারা তিনজনেই এখন ছইয়ের বাইরে। আর তিনজনেরই পা নৌকার গুরার সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধা। নৌকা আর সেই খাড়ির ভিতরে নাই। হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে নয়া গাঙের সেই সর্বনাশা মোহনার দিকে।

তিলক চিৎকার করিয়া উঠিল, 'অ কিশোর, আর কত ঘুমাইবা, চাইয়া দেখ সর্বনাশ হইয়া গেছে।' এক ঝটকায় পায়ের বাঁধন ছিঁড়িয়া কিশোর এক নিঃশ্বাসে ছইয়ের ভিতরে গিয়া পাটাতন খুলিল। সে নাই।[৩]

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের উক্তি এ রকম :

> বস্তুত অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাসই পেয়েছে বদ্বীপভূমির... নদ-চুম্বিত গঠনশীল-নিত্য জায়মান ও চকিতে ভেঙে যাবার অনিশ্চিত জীবনের ছকটিকে আয়ত্ব করতে।[৪]

মালোদের জীবন প্রবাহের মধ্য দিয়েই তৈরি হয়েছে উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্র। এইগুলোর আগমন-প্রস্থানের সময়কালই যেন কাহিনীর ভিত্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। মালোদের অনির্দিষ্ট জীবনপ্রবাহ ও অনির্দিষ্ট নদীপ্রবাহ এ উপন্যাসের গঠন শৈলীর উপরও যেন প্রভাব ফেলছে। সে-কারণেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :

> .....উপন্যাসটির গঠন নির্দোষ নহে। উহার ঘটনা বিন্যাস এককেন্দ্রিক নহে, বহুস্তর বিভক্ত; উহার প্রধান চরিত্রসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন। উহার ঘটনা পরিণতিও নানা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু একভাব-সূত্র-গ্রথিত আখ্যানের যোগফল, কোন বিশেষ চরিত্রের অনিবার্য ক্রমবিকাশাভিমুখী নহে।[৫]

তিনি আরও বলেছেন :

> বদ্ধমূল সংস্কৃতি চর্চায়। কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়, এই সমষ্টি জীবনের চিত্রাঙ্কনে তাহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।[৬]

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ কথারই প্রতিধ্বনি লক্ষ্যযোগ্য অন্য একজন সমালোচকের কথায় :

> মানুষ ও প্রকৃতির বিশাল পটভূমিতে তিনি আসলে এই উপন্যাসে নদী ও মানুষের এক চিরায়াত যুগলবন্দী রচনা করেছেন।[৭]

সমষ্টি-জীবনের চিত্রাঙ্কনের সাফল্য দিয়েছে এ উপন্যাসকে শিল্প মর্যাদা। একই প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য এর কাহিনী, চরিত্র, ভাষা, সংলাপ, পরিবেশ, এমনকি লেখকের জীবনবোধও। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের গঠন প্রক্রিয়া অগ্রসর হয়েছে ছোট ছোট ঢেউয়ে আবর্তিত হয়ে কিছু দূর পর পর বাঁক নেয়া নদীর মতো। প্রায়ই একটি নতুন মোড়, একটি নতুন ঘটনা, একটি নতুন চরিত্র, একটি নতুন পরিবেশ। তবে সব কিছুরই উৎস এক। একটি উন্নত উপন্যাস সম্পর্কে একজন সমালোচকের ধারণাও এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যেতে পারে :

> The well made book is the book in which the subject and the form coincide and are indistinguishabley—the book in which the matter is all used in a form, in which the form expresses all the matter.[৮]

বলা বাহুল্য, ঔপন্যাসিক উপর্যুক্ত বিধান সব সময় মেনে চলতে পারেন নি। বিশাল পটভূমিতে বিস্তৃত এই কাহিনী পূর্বেই সুপরিকল্পিত এমনটি বলা কঠিন। কিন্তু গভীরভাবে মনোযোগ দিলে উপলব্ধি করা যায় যে, শিল্পসৃষ্টির আগ্রহের সঙ্গে কাহিনীর যেন একটি আত্মিক মিল রয়েছে।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে তিতাস নদীর 'শাহী মেজাজ' উপস্থাপনের মাধ্যমে। তিতাস নদীর স্বাভাবিক ধারার সঙ্গে ঔপন্যাসিক তুলনা করেছেন পাশের নদী বিজয়ের। যার তীরবাসীরা শুকনোর সময় পড়ে বিপদে। নদীর পানি সে-সময় যায় শুকিয়ে। এমনকি বন-জঙ্গলের ডোবা-নালায়ও যে মাছ পাওয়া যায় না, তা নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ মালোর জীবন-বেদনায় হয়েছে রূপায়িত।

তিতাস তীরবাসীদের এমন হয় না কখনও, সারা বছর সে নদীতে মাছ থাকে, থাকে পানি। তিতাসের তীরে সোনালী ফসলও ফলে বারো মাস। তিতাস-তীরের কৃষক জোবেদ আলী এবং তার কৃষিজীবী শ্রমিক করমালী ও বন্দালী। করমালী ও বন্দালীর রয়েছে আর্থিক সংকট। এ সংকট মেটাতে তাদের স্ত্রীরাও

অন্যের বাড়ি কাজ করে। কৃষক ও জেলেদের জীবন ও সংসার উপন্যাসের প্রথম অংশের প্রথম ভাগে যে গতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে তা পরবর্তী পর্যায়ে টেকে নি। উপন্যাসের প্রথম অংশের দ্বিতীয় ভাগে লেখক হঠাৎই যেন মালোদের ধর্মীয় অনুষঙ্গ এনেছেন : মাঘমণ্ডপের পূজায় 'চৌয়ারি' ভাসানো। দুই দুরন্ত প্রতিবেশী কিশোর ও সুবল। দরিদ্র পিতার সন্তান তারা। সংসারের অভাব মেটানোর জন্যে স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসে তারা তিতাস নদীর জলে। তিতাসে মাছ ধরে তারা সন্তুষ্ট নয়, ভাবে অধিক উপার্জনের কথা। পরিশেষে তারা অভিজ্ঞ জেলে তিলককে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছায় শুকদেবপুরের 'খলা'য়। এ পথে যেতে যেতে মাঘমণ্ডপের পূজায় বাসন্তীর জন্যে 'চৌয়ারি' বানানো ও ভাসানোকে কেন্দ্র করে সংঘটিত ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনা করে সুবল ও কিশোর। কিশোরের প্রতি বাসন্তরি টান লক্ষ্য করেছে সুবল। সে-কারণে সুবল বাসন্তীর প্রতি নিজের অনুরাগ গোপন রেখেই বলেছে, বাসন্তী কিশোরের। কিশোর-বাসন্তী-সুবল এ তিন জনের মধ্যে 'চৌয়ারি' ভাসানোকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রেমের আবেশ বেশি বিস্তার লাভ করে নি। তিন জনের এ প্রেমবৃত্তকে ঘিরে ঔপন্যাসিক তৈরি করতে পারতেন একটি ত্রিভুজ প্রেমের কাহিনী। এবং কিশোরকে লেখক নিয়ে আসতে পারতেন উপন্যাসের মূল চরিত্রে। লেখক তা করলেন না, তিনি শুকদেবপুরের 'খলা'য় আকস্মিকভাবে কিশোরকে পাইয়ে দিলেন এক সুন্দরী নারীর প্রেম ও প্রণয়। ঘটনার আকস্মিকতা এখানেই শেষ নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হলো গোকণঘাটে ফেরার পথে মেঘনার মোহনায় ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া এবং স্ত্রী-সম্পদ উভয় হারিয়ে কিশোরের পাগল হয়ে যাওয়া। ফলে কাহিনীর ব্যাপক সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়; পরিণতিতে বাসন্তীর বিয়ে হয় সুবলের সঙ্গে। এখানেও কাহিনী প্রবাহিত হতে পারত একটি নির্দিষ্ট গতিতে, যদি সুবলকে অপমৃত্যুর শিকার না করে তার হাতে লেখক তুলে দিতেন মালোদের জীবন বদলের দায়িত্ব। তখন সুবলও হতে পারতো উপন্যাসের নায়ক। বস্তুত, সুবলের মৃত্যু উপন্যাসের কাহিনীর আর এক সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছেন বলে অনুমান করা যায়। 'নয়াবসত' অংশেও ঘটনার আকস্মিকতা লক্ষ্য করা যায় চার বছর পর কিশোরের স্ত্রী ও তার গর্ভের সন্তান অনন্তর সংবাদ পাওয়ায়। নদীর তীরে গৌরঙ্গ মালো ও নিত্যানন্দ মালো পেয়েছিল মৃতপ্রায় অনন্তর মাকে। 'রাজার ঝি' বলে তারা তাকে লালন পালন করেছিল। নদী তীরের মৃতপ্রায় কিশোরের স্ত্রীকে সেদিন পেতে পারত অন্য কেউ। এবং তার ফলে কাহিনীর মোড়ও ঘুরে যেতে পারত। তা হয়নি; পরিকল্পিত এ কাহিনীতে তাই একাধিক আকস্মিকতার বোঝা অনন্ত ও তার মায়ের মাথায় চাপিয়ে লেখক

গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দকে দিয়ে তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন গোকণঘাট। সেখানে তাদের কেউ ছিল না। সম্বল বলতে অনন্তর মা-র ছিলো সামান্য অর্থ। এ পরিস্থিতিতে বড় বেকায়দায় পড়তে হয় অবলম্বনহীন ঐ নারীকে। তার নানা পরিস্থিতির পটভূমিতে হয়তো লুকিয়ে ছিলো স্বামী সন্ধানের আগ্রহ। একটি ভাঙা মন নিয়ে কয়েকজন সহানুভূতিশীল নারীর সহায়তায় সম্ভব হয়েছে অনন্ত ও তার মায়ের গোকণঘাটে বসবাস করা। কাহিনীর এ পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় মালো সমাজের নিত্য দিনের বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ।

উপন্যাসের পরবর্তী ভাগ 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ'। এর মধ্যেও লেখক মালো সমাজের জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে প্রসঙ্গে তাদের চিন্তা ভাবনা এবং ধর্মীয় রীতি-নীতি প্রকাশ করেছেন। জন্মের জন্যে তারা অন্ন-প্রাসনসহ নানা রকম অনুষ্ঠান করে। মৃত্যু ও বিয়েতেও তারা খরচ করে দু' হাত ভরে। উপন্যাসের এ পর্যায়ে এ ছাড়াও উপস্থাপিত হয়েছে মালেদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড যার সঙ্গে পূর্ববর্তী ভাগের অনন্ত ও তার মায়ের কঠিন জীবন বাস্তবতার নেই সঙ্গতি। এ যেন বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন জীবনের জলছাপ। তবে দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে এখানে সম্ভাবনা জেগেছিল, অনন্তর মা ও কিশোরের বৈবাহিক জীবনকে প্রলম্বিত করার। বাসন্তীর সঙ্গে গল্প করে অনন্তর মা বুঝতে পারে, কিশোর পাগলই তার স্বামী। তারপর সে তাকে ভালো করার জন্যে প্রাণান্ত চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয় অনন্তর মা। ঐপন্যাসিক ইচ্ছা করলেও এ সম্ভাবনা দিয়ে তৈরি করতে পারতেন উপন্যাসের নতুন প্রবাহ। কিশোর যে নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে গমন করেছিলো শুকদেবপুরের 'খলা'য়, তা লেখক অব্যাহত রাখতে পারতেন, এবং দ্বিতীয়বার কিশোরের নেতৃত্বেই গড়তে পারতেন মালোদের ভবিষ্যৎ জীবন পরিকল্পনা। দুঃসাহসিকতা-নির্ভর কাহিনী নির্মান করেন নি অদ্বৈত মল্লবর্মণ, যেমনটি করেছিলেন মানিক বন্দোপাধ্যায়। 'পদ্মানদীর মাঝি'তে কুবের ও কপিলার অসামাজিক প্রেম যখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো. ঠিক তখনই কপিলার স্বামী শ্যামদাস আকুরটাকুর থেকে চরে আসে কুবেরের বাড়ি কেতপুর। তখন সমাজ অনুশাসন মেনে কপিলা স্বামীর সঙ্গে চলে যায় আকুরটাকুর। কুবের তাকে রাখতে পারে নি, মনের থেকে ছাড়তেও পারে নি। কপিলার চলে যাওয়ার পর দারুণ অসহায় বোধ করেছিল কুবের। কিন্তু পরবর্তী সুযোগ যেন হারাতে চায় নি কুবের-কপিলা। গোনঝির বিয়েতে কেতুপুর আসে কপিলা এবং ঘটনার অনিবার্যতায় কুবেরের সঙ্গে চলে যায় ময়নাদ্বীপ। সব কিছুকে এভাবে তুচ্ছ করে কপিলার এই চলে যাওয়া এবং তাকে সঙ্গে নেওয়ায় জয় হয় প্রেমেরই। অদ্বৈত মল্লবর্মণ কেন যেন

চান নি এ রকম প্রেমের তোড়ে ভেসে বেড়ানো। এখানেই তাঁর পরিকল্পনার মাত্রা অনুধাবন করা যায়। তিনি একটি শুদ্ধ কাহিনী গড়ার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন মালোদের জীবন বাস্তবতা রূপায়িত করার দিকে। চার দিনের ব্যবধানে কিশোর ও বাসন্তীর মৃত্যু ঘটিয়ে যেন মূল কাহিনীকে প্রায় হত্যাই করেছেন তিনি। উপন্যাসের তৃতীয় অংশের প্রথম ভাগেও লক্ষ্য করা যায় তিতাস নদীর সঙ্গে মানুষ ও হাট-বাজারের সংশ্লিষ্টতা-বিষয়ক ঘটনাবলি। এ সব ঘটনা নিত্য দিনের হলেও তার মাধ্যমে উপন্যাসের ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করা হয় নি। বনমালীর মাধ্যমে কাদির মিয়ার প্রায় ডুবে-যাওয়া আলু ভর্তি নৌকা রক্ষা পায়। বনমালীর নদীতে বিচরণের সূত্র ধরে কাহিনী গতি পেয়েছে, বনমালীর মাধ্যমেই অনন্ত গিয়েছে নবীনগর। উপন্যাসটিতে নবীনগরবাসীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে 'জালাবিলা', 'মনসাপূজা', 'পদ্মাপুরাণ পাঠ'-এর উপস্থাপনা দেখা যায়। অবশ্য এ ধরনের ধর্মীয় বিষয় নৌকা বাইচের মতো সর্বজনীনতা অর্জন করে নি। 'রাঙা নাও' পর্যায়ে কৃষক কাদির মিয়ার ছেলে ছাদির মিয়া তৈরি করে বাইচের নাও।

ছাদির মিয়াকে কেন্দ্র করে লক্ষ্য করা যায় মুসলমান সমাজের বিয়েতে যৌতুক প্রসঙ্গ। ঋণ গ্রহণের ফলে কাদির মিয়ার প্রতারণার শিকার হওয়া এবং মামলা-মোকদ্দমা সম্পর্কিত নানা ঘটনা উপন্যাসের কাহিনীতে স্থান পেয়েছে ছোট ছোট ঘটনার মতো। কাহিনীর এ পর্যায়ে উল্লেখ করার মতো ঘটনাগুলো বাইরের বাইচের নৌকা তৈরির সঙ্গে সম্পর্কিত। কাঠ সংগ্রাহকদের নানা ধরনের পেশা, কাঠ চেরাইকারী করাতি, কাঠ মিস্ত্রীদের সঙ্গে জড়িত নৌকার নকশাকার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পেশার এ সব শ্রমজীবী মানুষের উল্লেখ আছে কাহিনীর এই অংশে। নৌকা বাইচকে কেন্দ্র করে ঘটেছে আকস্মিকভাবে কয়েকটি ঘটনা। অগণিত দর্শকের নৌকাগুলো নদীতে ভাসমান, কিন্তু কেমন করে যেন উদয়তারা-বনমালী-অনন্তর নৌকা বাসন্তীর নৌকার পাশে এসে উপস্থিত হলো। পরিণতিতে বাসন্তী মার খায়, অপমানিত হয় উদয়তারা ও তার সঙ্গীদের হাতে। আবার এতো আয়োজন করে সাজানো যে বাইচের অনুষ্ঠান, তা-ও হঠাৎ করে থেমে গেল গোলযোগেরই কারণে। ও দিকে নৌকা ভেঙে যাওয়ার ফলে নদীর স্রোতে ভেসে গিয়ে প্রাণ হারানোর উপক্রম হলো ছাদির মিয়ার।

এমন সময় এখানেই আলুর নৌকা রক্ষাকারী বনমালী হাত বাড়িয়ে নৌকায় তুলে নেয় ছাদির মিয়াকে। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ছাদির মিয়া বনমালী ও তার সঙ্গীদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেল তার বাড়ি। অন্য দিকে সন্তানতুল্য অনন্তর জন্যে মার খেয়ে অপমানিত বাসন্তী চলে গেল তার মায়ের আশ্রয়ে। লেখক যেন

বাসন্তীর প্রতি একটু বেশি নির্মম হয়েছেন; নইলে বিয়ে কিছু দিনের মধ্যে হয়তো হতো না তার স্বামীর অপমৃত্যু। এ প্রসঙ্গে লক্ষণযোগ্য যে, রামপ্রাসাদের মাধ্যমে বিধবা বিবাহ চালু করতেও পারে নি লেখক; কিংবা ময়না বা তার মতো অন্য কারো সঙ্গেও লেখক দেখান নি বাসন্তীর সম্পর্ক। লেখক ইচ্ছা করলে অনন্তর মা ও অনন্তকে ফিরিয়ে না এনে, বাসন্তীর সঙ্গে কিশোরের প্রেমের অব্যাহত সম্পর্ক রচনা করতে পারতেন। লেখক তা করেন নি। বরং বাসন্তীকে জাগিয়েছেন অন্য চেতনায়, নিজেদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে। ঐপন্যাসিক এ দায়িত্ব দিতে পারতেন অনন্তকে। মেধাবী অনন্ত উচ্চ শিক্ষার জন্যে গিয়েছিলো কুমিল্লা শহরে। অনন্তর কাছে মালোদের অনেক প্রত্যাশা; তমসুকের খত লেখানোর জন্য লোকের অভাব তাদের মিটবে। অনন্ত এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশা পূরণের হাতিয়ার হতে পারতো; লেখক চাইলে তাকে সমাজ পরিবর্তনের নেতা বানাতে পারতেন। সামন্ত-জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে একজন সংগ্রামী বিপ্লবী হিসেবে তাকে গড়ে তোলা যেতো। সঙ্গে তার বাল্য প্রেমের ঘটনাটিও বিকশিত হতে পারতো। এমনকি অনন্ত হতে পারতো অনন্ত বালার প্রেম ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এক সংগ্রামী যুবক। অনন্তর উচ্চ শিক্ষার প্রজ্ঞায় বদলে যেতে পারতো মালোদের দুঃখের দিন। কিন্তু সেটি হয় নি। অনন্তকে তিনি যেন তার নিজের জীবনের ছায়ায় তৈরি করেছেন। উপন্যাসের শেষ অংশের প্রথম ভাগ 'দুরঙা প্রজাপতি'তে ছাদিরের বাড়িতে বনমালী, উদয়তারা ও অনন্ত যে পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হলো তা বৃহত্তর সমাজ পরিসরের ওপর ফেলে না কোন প্রভাব। বাসন্তী ও মোহন বাইরের চটুল যাত্রাগানের সংস্কৃতি থেকে নিজেদের সুস্থ সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সৃষ্টি করতে চেয়েছে জনমত। তারা প্রথমে এভাবে মালোদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেও, পরে তা আর সম্ভব হয় নি। কারণ, ধীরে ধীরে তিতাসের মাছও যায় কমে। ঠিক এমন একটি সময় ঋণদান কোম্পানির বিধিভূষণ পাল মালোদের মাথায় চাপিয়ে দেয় আরও ঋণের বোঝা। এক দিকে আয়ের উৎস বন্ধ হয়েছে নদী ভরাট হওয়ার ফলে, অন্যদিকে ঋণের বোঝা। ফলে, জীবন বাঁচাতে মালোরা চলে যায় নিজ গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র। উপন্যাসের শেষের দিকে অনন্ত এসেছিল মালোদের সাহায্য করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাসন্তীর কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে চলে গেছে অনন্ত। ঔপন্যাসিক উপন্যাসে এ রকম নানা ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন যেগুলো মালোদের জীবনেরই বাস্তবতার প্রতিরূপ।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক কেন্দ্রীয়ভাবে এমন কোন একটি চরিত্রকে বিকশিত করেন নি, যাকে ঘিরে আবর্তিত হতে পারতো অন্যান্য

চরিত্র। রচনাটিতে স্থান পেয়েছে তিতাস তীরের মালোদের জীবনের একের পর এক ঘটনা। তবে এ ঘটনাগুলো এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করে নি তিতাস। তিতাস একটি নদী। সে বয়ে যায় নিজের মতো। তার মাছের ভাণ্ডার দিয়ে সে সাহায্য করেছে মালোদের। এবং এভাবেই এ উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিতাস নদী থেকেছে ক্রিয়াশীল। ফলে, উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান চরিত্রে যেন রূপায়িত হয়েছে তিতাস নদী। কিন্তু তারপরও মানুষ নামক নিয়ন্ত্রকদের হাত থেকে তার রেহাই ঘটে নি। অর্থ ও ক্ষমতার জোরে মালো পাড়া নিয়ন্ত্রিত করেছে ধনীরা, মহাজনরা। নানা ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কগুলো চিহ্নিত করা কঠিন নয়। কিন্তু অবশেষে বলতে হয় যে, ঔপন্যাসিক প্রথাগত কোন উপন্যাস লিখতে চান নি। কোন সুবিন্যস্ত কাহিনী বিকশিত হয় নি 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে। অবশ্য উপন্যাস-শিল্পকে কোন কঠোর নিয়মের ফ্রেমে বেঁধে রাখা উচিত কি না, সেটাই এক প্রশ্ন। সে দিক থেকে বেচার করলে সামগ্রিকভাবে 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে উপন্যাস বলা যেতে পারে।

উপন্যাসের শিল্পরূপ আলোচনায় কাহিনীর মতো চরিত্রও গুরুত্বপূর্ণ, বিশেস করে কাহিনীর গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' কাহিনীতে ঔপন্যাসিক তিতাস তীরের মালোদের জীবন বৃত্তান্ত উপস্থাপন করেছেন। ফলে নানা প্রসঙ্গে উপন্যাসে এসেছে প্রায় অর্ধশত নাম। প্রতিটি নামই কোন না কোন ভাবে উপন্যাসের কাহিনীতে রেখেছে কম বেশি ভূমিকা। অবশ্য বিনা করণে কোন চরিত্রের উপস্থিতি খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। এ উপন্যাসটিতে শিশু-যুবা-বৃদ্ধ সব সয়সের চরিত্রের রয়েছে উপস্তিতি। অনন্ত ও রমু উপন্যাসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিশু চরিত্র। বিশেষ করে অনন্তর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক সমাজ, সংস্কৃতি ও প্রকৃতির নানা বিষয় তুলে ধরতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> অনন্ত আর রমু মালোদের পরিবার-চ্যুত একলা একটি বালক আর চাষী মুসলমান একটি সচ্ছল পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী বালক, এই দুইয়ের মারফৎ গড়ে উঠেছে তিতাসের অন্দর্বয়ন। নিপুণ সেই বুনট। আর সভ্যতা-সংস্কৃতির আদি যুগের বার্তা থাকায় এই দুটি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ উপন্যাসের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষ্য বা পাঠ রচনা করে।[৯]

অনন্ত ও রমুর মাধ্যমে উপন্যাসে এসেছে অনেক কথা। অনন্ত আছে উপন্যাসের অনেকাংশ জুড়ে। রমুর বিস্তৃতি ততটা নয়। নৌকা বাইচকে কেন্দ্র

করে রমুর কতকগুলো ঘটনা অবলোকনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ঔপন্যাসিকের মূল দৃষ্টি নদীর জল ব্যবহারকারীদের দিকে, নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহকারী জেলেদের কথাই এখানে মুখ্য। অন্যান্য যারা নদীর সঙ্গে জীবিকার প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্ট নয়, তারা গৌণ। সে-কারণেই হয়তো রমুর উপস্থিতি উপন্যাসে ভিন্ন ধাঁচের। তবু তিতাস তীরের মানুষের জীবন বৃত্তের প্রতিনিধি অনন্ত ও রমু।

'খলা' বাইতে গিয়ে কিশোর এক মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং মালাবদলের রীতিতে 'গান্ধর্ব' মতে তাকে বিয়ে করে। তাদের সন্তান অনন্ত। শুকদেবপুর থেকে স্বামী কিশোরের সঙ্গে গোলণঘাটে ফেরার পথে ডাকাত কর্তৃক আক্রান্ত হয় তারা। কিশোরের স্ত্রী নিজেকে রক্ষা করার জন্যে নদীতে ঝাঁপ দেয়। পর দিন নদী তীরে তাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পায় গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মালো। এই মালোদের সংসারেই জন্ম হয় অনন্তর। অনন্ত ও তার মা গৌরাঙ্গ মালো ও নিত্যানন্দ মালোর আশ্রিত। শৈশবেই অনন্তের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিলো এক অনুসন্ধিৎসু মন। চার বছর বয়সেই সে যেন তার নিজস্ব এক ভুবন তৈরি করে নেয়। গোকণঘাটে যাওয়ার সময় অনন্ত তার সেই নিজস্ব ভূবনের যাবতীয় উপকরণ সঙ্গে নিয়েই নৌকোয় ওঠে। শিশু সংগ্রাহক অনন্তর সপ্তকে ছিল 'কয়েকটি ছবির টুকরো, দেশলাইর খালি বাক্স, জাল বুনিবার দুই-একটা ভাঙ্গা উপকরণ, কিছু সূতা, ছেঁড়া একখানা ভক্তিতত্ত্বসার, এক টুকরা পেনসিল।[১০]

নিজের গড়া এই রাজ্য ছেড়ে নতুন রূপকথার রাজ্যে যাত্রা অনন্তর। প্রথম নৌকায় চড়ে অভিভূত সে। এক সময় নদীর গল্প শুনে অনন্তর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠত; তখন গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মালো ভাবতো অনন্ত বড় হয়ে মস্ত জেলে হবে। আজ সেই নদী তার নিজ বিচরণ ক্ষেত্র যেন। সে আরও বিস্মিত হয়ে দেখছে নদী ও প্রকৃতি। বড় গাঙের পাগল অনন্ত মায়ের কোল থেকে নেমে গিয়ে নদী দেখছে। নদীর তলদেশের বালিময় রূপ ও নানা রকম ছোট মাছ স্বচ্ছ পানিতে দৃশ্যমান। এ বিষয়ে উপন্যাসের এক স্থানে বলা হয়েছে :

> দুই-একটা শামুক হাঁটিয়াছে, তার রেখা বালির বুজে আঁচড় কাটিয়াছে। ছোট ছোট বেলে মাছ সে বালিতে বুক লাগাইয়া চুপ করিয়া আছে,... আর সেই শামুক চলার দাগ, কম জল হইতে ক্রমে বেশি জলের দিকে চলিয়া গিয়াছে।... ওখানটাতে কি রহস্য। নামিলে পায়ে মাটি ঠেকিবে না। আরও একটু দূরে বুঝি ঐ দাঁড় দিয়াও মাটি ছোঁয়া যাইবে না। সেখানটাতে আরও কত রহস্য![১১]

অনন্ত এই রহস্যের সন্ধান পায় নি, বিস্মিত মন নিয়েই পৌঁছে গেছে নতুন বসত গোকণঘাটে। নদীর এই বয়ে চলাকে সময়ের সঙ্গে, মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করেই ঔপন্যাসিক যেন বলেছেন :

> সে তো নদী নয়, হাজার বছরের না শোনা গল্প দুই তীরের বাঁধনে পড়িয়া একদিকে বহিয়া চলিয়াছে।[১২]

অনন্তরাও যেন ঠিক সেই না শোনা গল্পের পাতার সঙ্গে নতুন একটা পাতা যোগ করেছে।

অনন্তরাও যেন ঠিক সেই না শোনা গল্পের পাতার সঙ্গে নতুন একটা পাতা যোগ করেছে গোকণঘাটের মালো সমাজে ঠাঁই পেয়ে। অজানা পরিবেশে কালোবরণের মা ও বাসন্তী অনন্তর মাকে সাহায্য করেছে নানাভাবে। মায়ের মৃত্যুর পর অনন্ত বাসন্তী মাসীর ওপর হয়ে পড়ে নির্ভরশীল। মাসীর বাবার অভাবের সংসারে অনন্তর অবস্থান সুখের হয় নি। উপায়হীন অনন্ত কখনও কখনও বাজার থেকে দোকানীর ফেলে দেয়া পচা পান কুড়িয়ে আনত বাসন্তী মাসীর মায়ের জন্যে। তাতে বাসন্তীর প্রতি তার মায়ের বকাবকি থামত না। এক দিন অনন্তর জন্যেই মা-মেয়েতে হাতাহাতি হয়। মা-মেয়ের সম্পর্কের এই অবনতির মুখে অনন্তর প্রতি বাসন্তীর স্নেহে ভাটা পড়ে। ফলে অনন্ত পাড়ি জমায় অন্যত্র।

নদী ও কাল বয়ে চলে বিরতিহীন। ঐ তিতাসের সঙ্গেই অনন্তর সাক্ষাৎ; ফলে নদী তিতাস ও মানুষ অনন্ত অন্তহীন গতি প্রবাহের মধ্যে মিশে গেছে। এই নদী প্রবাহই যেন অনন্তর জীবনে এক নিয়ামত; তাকেও তাই চলতে হয়েছে পথে পথে। মাসীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এক গন্তব্যহীন পথে তাকে যেদিন পড়তে হয়েছে সেদিনও নদীর সঙ্গে তার যেন সূচিত হয়েছে এক গভীর সম্পর্ক। গোকণঘাটে আসার পথে নৌকোয় মায়ের কোলে বসে যে কল্পনাচারিতায় অনন্ত নৌকার অস্তিত্ব ভুলে লক্ষ্য করেছিলো নদীর প্রবহমানতা, আজও তেমনি গভীর মনোনিবেশে সে দেখলো নদী।

এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিক বলেছেন :

> এখান হইতে সোজা দক্ষিণ দিকে নদীর গতি। চাহিলে শেষ অবধি দেখা যায়, বহু দূর দূরান্তর হইতে দক্ষিণের রাজ্য হইতে কেউ বুঝি ঢেউ চালাইয়া দেয়, সেই ঢেউ আসিয়া লাগে অনন্তর এই নৌকাখানাতে সেদিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া থাকে।[১৩]

ভাঙা নৌকার আশ্রয় ছেড়ে অভিমানী অনন্ত আর ফেরে নি বাসন্তী মাসীর কাছে। এখন থেকেই বাকারে পরিচিত বনমালী অনন্তকে নিয়ে যায় নবীনগরে। নৌকায় বনমালীর বোন উদয়তারার কোলে শুয়ে গভীর রাতে আকাশের তারা আর প্রকৃতির রূপ দেখে অনন্ত বিস্ময়বোধ করে। জলের মধ্যে তারার ছায়া দেখে অনন্তর মনে পড়ে জলের তলের রহস্যের কথা। মায়ের কাছে শোনা সিন্দাবাদের দৈত্যের কাহিনী, আরব্য উপন্যাসের কল্পকাহিনী, আকাশ থেকে ধপাস ধপাস করে পড়ে চারিদিক কাঁপিয়ে দেও-দৈত্য আসার গল্প। আকাশের রহস্য প্রসঙ্গে নানা লোক-কথা, লোক-বিশ্বাস, সংস্কার, স্মৃতি-পুঞ্জিত কিংবদন্তী, দেব-দেবীর কথা একাকার করে উপন্যাসে যেন অন্য এক নতুন কল্পলোকের সৃষ্টি করা হয়েছে। কল্পনাবিলাসী অনন্ত উদয়তারার কোলে বসে কল্পনা করে :

> নদীর স্রোত তাহাকে দেশ দেশান্তরে ভাসাইয়া নিবে, ঢেউ তাহাকে দোলা দিবে।[১৪]

সে-নিবিড় অন্ধকারে একমাত্র অনন্তই জেগে থাকবে, আর জেগে থাকবে জলের মাছ। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> অনন্ত জীবন প্রবাহ আর এই নক্ষত্রমণ্ডলীর মাঝখানে নদীর মতোই অনাদি অনন্ত সচল বর্তমানে আকাঙ্ক্ষা অনন্তর। আর তার দৃষ্টিভঙ্গিতেই উপন্যাসে বাস্তব আর পরাবাস্তব যেন অন্তহীন সমান্তরলতার জন্ম দিয়েছে।[১৫]

ঔপন্যাসিক বার বার রঙধনু দেখিয়েছেন অনন্তকে। লেখক যেন জীবনের রূপকে প্রতীকী মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। রঙধনুর আগমন ও প্রস্থানের আকস্মিকতার মতোই অনিশ্চিত যেন গোকণঘাটের মালো-জীবনের পরিস্থিতি। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের উক্তি :

> প্রকৃতিতে যখন রঙধনু ওঠে তখন জীবনেও তা ব্যাপ্ত হয়, সে-কারণে তিতস ত শুধু একটি নদীর নাম নয়, সে যে মৃত্তিকা ও মানুষের কাহিনীকেও বুনে চলে।[১৬]

অনন্ত মেধাবী ছাত্র। তার প্রতিভায় মালোরা মুগ্ধ। সকলে অনন্তর ব্যাপারে তাই পোষণ করতে থাকে উচ্চাশা। অনন্তকে মালোরাই ভর্তি করিয়ে দেয় গোপালখালি মাইনর স্কুলে। চিঠি লিখতে, তমসুকের খত লিখতে, বেপারীর সঙ্গে মাছের খাতার হিসাব লিখতে মালোদের যেতে হয় হরিদাস সাঁর কাছে। তাকে

অনেক অনুরোধ করে, বড় বড় মাছ দিয়ে, টাকা দিয়েও অনেক সময় কাজ পেতে কষ্ট হয়। মালোদের এই অভাব মেটানোর দায়িত্ব যেন বর্তায় অন্তর কাঁধে। কিন্তু লাভ হয় নি মালোদের। নাপতানীর পরামর্শে আর নিজ আগ্রহে উচ্চ শিক্ষার আশায় অনন্ত চলে যায় শহরে। নবীনগরে এসে অনন্তর সঙ্গে পরিচয় ঘটে অনন্তবালার। অনন্তবালা সেই বাল্য বয়সেই কথার বাঁধনে বাঁধতে পেরেছিল অনন্তকে, সে তাকে তার আগামী দিনের বর মনে করেছিলো। কিন্তু অনন্তবালার ইচ্ছার প্রতি অনন্তর কোন সমর্থন ছিল না। সে কথা অনন্তবালা মনে হয় বুঝেছিলো; অনন্তর লেখাপড়ার আগ্রহের কাছে অনন্তবালার ভালোবাসার আহ্বান ছিলো একটি গৌণ বিষয়। তবু অনন্তবালা সম্ভবত অনন্তর আশাতেই রাজি হয় নি অন্যত্র বিয়ে করতে। অনন্তবালার বাবা এক রকম বিরক্ত হয়েই বনমালীকে পাঠায় কুমিল্লা শহরে অনন্তর কাছে। সেখানে অনন্তর বেশভূষা দেখে বনমালী হয়ে যায় সঙ্কুচিত। চলে আসার সময় তার স্বগতোক্তি শুনে ফেলে অনন্ত। অবশেষে অনন্ত যথোচিত সামাজিকতা করেই আপ্যায়ন করে বনমালীকে, ভদ্রতা করে কতগুলো কাপড় কিনে দেয় গ্রামের লোকদের জন্যে। কিন্তু অনন্ত একবারও অনন্তবালার নাম মুখে আনে নি; এবং বনমালী এ সম্পর্কে কোন কথা অনন্তকে বলতে সাহস করে নি। এমনকি জীবিকার অভাবে যেদিন মালোরা ধ্বংসের মুখে, সে-দিনও তাদের বাঁচাতে আসে নি অনন্ত। লেখাপড়া শেখার ফলেই সে যেন শ্রেণীচ্যুত হয়ে উঠে গেছে ওপরের শ্রেণীতে। রামকেশব ও বাসন্তীর অন্তিম সময়ে মানব কল্যাণের নামে তাদের মুখোমুখি হলেও পরিচয় গোপন করেছে অনন্ত। লেখক বাসন্তী ও মোহনের সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব অনন্তর মাথায় তুলে দিলেও, তাকে যেন হতে দেন নি বিপ্লবী। মালেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, দারিদ্র্য-বিমোচনে অনন্ত তার বিদ্যার্জনজনিত শক্তি নিয়োগ করে নি।

রমু চরিত্রটির মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক চাষী জীবনের উত্তরাধিকার, হিন্দু-মুসলমানের স্বাভাবিক বন্ধুত্বের বন্ধন এবং এ অঞ্চলের মানুষের সর্বজনীন উৎসব 'নাও দৌড়ানি'র প্রতি সবার আগ্রহ তুলে ধরেছেন। রমুর মাধ্যমে লেখক একই সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন চাষীদের জীবন-যাপনের ধরণ এবং তাদের ধর্মাচরণ ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড।

রমু সহজ-সরল, গল্পপ্রিয় ও কৌতূহলী বালক। তার সাফল্য প্রকাশ পেয়েছে তার পিতা ছাদির মিয়ার কথায়। ছাদির মিয়া মনে করে রমুর ব্যবসা করার মতো বুদ্ধি নেই। গল্পপ্রিয় রমুর মধ্যে কাঠসংগ্রাহক ঈশ্বর মালো ও ইচ্ছারাম মালো

গভীর উদ্দীপনা তৈরি করে। নৌকা বাইচের নৌকা তৈরির সময় আনন্দে আত্মহারা রমু কাঠ-সংগ্রাহক, মিস্ত্রি, করাতি প্রমুখের সঙ্গে গড়ে তুলতে চায় নির্মোহ সম্পর্ক। ঈশ্বর মালো ও ইছারাম মালো কত পাহাড় ডিঙিয়ে খাল-বিল পেরিয়ে দেশ দেশান্তরের অনেক গল্প যেন কাঠের সঙ্গে নিয়ে আসে। রমু মনে মনে ভেবেছিল এদের কাছ থেকে অনেক গল্প জানা যাবে। কিন্তু তারা কাঠ বিক্রি করে চলে যায় যে যার পথে। তাদের চলে যাওয়া রমুর জীবনে এক গভীর দাগ কাটে। কাঠ-সংগ্রাহকেদের এমন নিভৃতে চলে যাওয়ায় সহজ সরল রমুর মনে হয় :

> যারা অনেক দূরের অনেক কিছু খবরাখবর বহিয়া বেড়ায়, তারা অধিকক্ষণ থাকে না, এমনি এমনি ধীরেও ও দৃঢ়তায়, এমনি ধীরে ও নিষ্ঠুরতায় তারা চলিয়া যায়।[১৭]

করাতিরা 'চান্ চুন চান্ চুন' শব্দ করে করাত চালিয়ে কাঠ থেকে তক্তা তৈরি করে। এর পর অস্থায়ী চাল দেয়া ঘরের মধ্যে মিস্ত্রিরা নৌকা তৈরির কাজ করে। হাতুড়ি বাটালির মাধ্যমে সারাদিন ডুম ডুম টাকুর ডুম নানা শব্দে দিগন্ত চকিত করে নৌকা তৈরি করে মিস্ত্রিরা। রমুর কাছে এ রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার। মিস্ত্রিদের আশ্চর্য ক্ষমতায় মুগ্ধ রমু। তাদের গাওয়া বুরজের গানটি রমুকে বেদনার্ত করেছে। এ গানে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ ও অমানবিক অস্পৃশ্যতার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। রমু মুসলমান সন্তান, অন্য দিকে সে অনভিজ্ঞ বালক বুরজের গানে তার মধ্যে জেগে ওঠা বেদনাবোধ যেন মানবিক ধর্মেরই প্রকাশ। ভুঁইমালীর মেয়ের হাতে জল খেয়ে বুরজের জাতি নষ্ট হয়। এরপর সে আর ব্রাহ্মণ সমাজে ফিরতে পারে নি, এঘটনা রমুকে কষ্ট দিয়েছে। রমু এতই বন্ধুপ্রিয় যে, সে ভাবে তার হাতে পানি খেয়ে কেন মিস্ত্রিদের জাত না যায়; গেলে অবশ্য ভালো হতো; তা হলে মিস্ত্রিরা সারা জীবন রমুদের বাড়ি থেকে যেত, তখন রমু গল্প করে আনন্দে দিন কাটাত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বাইচের দিন রমু যেতে পারে নি সে-উৎসব দেখতে। সে-উৎসব দেখেছে অনন্ত। বর্ণিল সে-উৎসব বিরামহীন চেষ্টায় যেভাবে উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছিল, বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ঠিক তেমনি যেন ভেঙে যায় উৎসবের সে-উচ্ছ্বাস। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> রামধনুর মতো হঠাৎ এক দণ্ডের আরো উৎসব-হঠাৎ মিলিয়ে যাওয়ার ছবি হয়ে থেকে গেল রমু আর অনন্তের দেখা সেই রাঙা নাও।[১৮]

বালক রমুর চোখ দিয়ে এ ঘটনাগুলো দেখানো এবং তা গভীর বেদনাবোধ দিয়ে, সহিষ্ণু মনোভাব নিয়ে উপস্থাপনের মাধ্যমে রমু চরিত্রটি হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল।

কিশোর চঞ্চল, রোমান্টিক ও ভাবুক প্রকৃতির। তার ভাবনা মূলত বাস্তবতাভিত্তিক। কিশোর ও সুবল বাল্য বন্ধু, দু'জনের স্বভাব চরিত্রের প্রকৃতি ভিন্ন রকম। তবু তার শৈশব থেকে যৌবনে পাড়ি জমায় একে অপরের হাত ধরাধরি করে। শৈশবে তারা স্কুলের পড়া ফাঁকি দিয়ে কলা গাছের খোল কেটে চটি জুতা তৈরি করতো। জুতা পায়ে দিয়ে কিশোর সুবলের কাছে ভক্তি চায়, নিজেকে বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী বলে দাবি করে। শৈশবের এই খেলার গণ্ডি পেরিয়ে তারা সক্ষম পুরুষ হয়ে ওঠে মালো সমাজের। নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্যে কিশোর উত্তরের প্রবাসে মাছ ধরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। জগৎপুরের ডহরে যাওয়ার পরিকল্পনাও কিশোরের। কিশোর তিলক ও সুবলকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করে উত্তরের পথে। জলের বুক চিরে নৌকার দাঁড় বেয়ে তারা নৌকা টেনে নিয়ে যায় মেঘনার দিকে। সীমাহীন সুদূর জলরাশির দিকে তাকিয়ে কিশোরের মনে জেগে ওঠে এক ধরনের আনন্দ শিহরণ। নয়াকান্দার মালোদের স্বাধীনতা ও সুখের কথা মনে পড়ে কিশোরের। রোমান্টিক কিশোর স্বপ্ন দেখে একটি সুন্দর পরিবারের। সে পরিবারে থাকবে একজন 'নারী', একজন 'নন্দিনী' এবং পুরুষটি থাকবে না রাতভর নদীর বুকে। পরিবার সম্পর্কিত কিশোরের এই পরিকল্পনাও অর্ধেক বাস্তব, অর্ধেক কল্পনা। কল্পনা ও বাস্তবতার ধ্যানে কিশোরের নৌকা ক্রমে এগিয়ে চলে উত্তরের দিকে। যাত্রাপথে কিশোর মালোদের সুখ-দুঃখ নিয়ে ভাবে। কিশোরের জানা মতে নয়াকান্দা, শুকদেবপুরের মালোরা রয়েছে সুখে ; সেভাবে তাদের সুখের কারণ সম্পর্কে। এখানকার মালোরা জলে-কাদায় নিয়ত সংগ্রামে অর্জন করেছে অন্য রকম এক যোগ্যতা; তার ফলে তার মাছ ধরা বন্ধ হলেও অনাহারে মরবে না। তাদের অর্জিত কৃষিকাজের যোগ্যতা দিয়ে তারা বাঁচতে পারবে। এখানকার মালোদের জীবনের সঙ্গে কিশোর তুলনা করে গোকণঘাটের মালোদের জীবন ধারা। শুকদেবপুরের মালোরা ক্ষেতে ধান বোনে। তারাই নিজেদের ধান কাটবে। তাদের এই গৌরবে কিশোর নিজেও আনন্দিত। ধান গাছের মধ্য দিয়ে নৌকা বেয়ে যাওয়ার সময় তাই কিশোর তিলককে আস্তে আস্তে লগি চালাতে বলে, যেন ধান গাছ নষ্ট না হয়ে যায়। অন্যের সুখে প্রসন্ন হওয়ার মতো মেজাজই কিশোরের বিশেষত্ব। নতুন দেশে পৌঁছে নতুন পরিবেশ ও মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে কিশোর আগ্রহী। তিলক বা সুবলের মধ্যে এ মনোভাব ছিলো না। সে কারণেই কিশোর 'মুগরাচণ্ডী' ফুল পছন্দ করেছে সহেজেই। নতুনের প্রতি তার এই অদম্য ভালো লাগার জন্যেই হয়তো মুহূর্তের মধ্যে কিশোর ভুলেছে বাসন্তীকে। এবং খলায় দোল উৎসবে প্রেমে পড়েছে কিশোরী নর্তকীর যা দেখে কিশোরের ওপর

থেকে সুবলের আস্থা হয়েছে অন্তর্হিত। সুবল ভাবত, বাসন্তী কিশোরের হাঁড়িতে চাল দিয়ে রেখেছে। সুবলের এই ধারণা ও কিশোরের নিজের বিয়ের পাত্রী সম্পর্কিত ভাবনার মধ্যেকার ব্যবধানই কিশোর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিশোর ভাবে :

> যারে লেংটা থাইক্যা দেখতাছি— ছোটকালে যারে কোলে পিঠে লইছি–হাসাইছি, কাঁদাইছি, ডি দেখাইছি, ভেউরা বানাইয়া দিছি— তারে কি বিয়া করণ যায়! বিয়া করণ যায় তারে, যার লগে কোনকালে দেখা-সাক্ষাৎ নাই।[১৯]

কিশোর ও সুবলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যবধান বাল্যকাল থেকেই। কিশোর জনৈক বেদেনীর সংস্পর্শে এসে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকে মাছ দিয়েছে বিনা পয়সায়। আর সেখানে সুবল মাছের বিনিময়ে তার কাছে চেয়ে রেখেছে সাবান। কিশোরের মনের এই আলাদা ধরনটি সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন :

> প্রথম নারী প্রেম সম্পর্কে তার বিশেষ ভাব আর দ্বিতীয় সমাজ সম্পর্কে কল্পনাচারিতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রকৃতির বিশালত্ব লক্ষ্য করে উত্তেজনাভাব আর উন্মনা হয়ে যাবার মনোবৃত্তি।[২০]

শৈশবের দুরন্ত চরিত্রের কিশোর পরিণত বয়সে হয়ে যায় ভাবুক এবং আবেগ, উচ্ছ্বাসভরা প্রেম-বিলাসী নিত্য পরিশ্রমী একজন জেলে। সে মালো সমাজের অনিশ্চিত ভবিষ্যত সম্পর্কে ভাবতে আগ্রহী। গোষ্ঠীগত উন্নয়নের চিন্তা তার চরিত্রটিকে করে দেয় কোমল ও মানবিক।

তিতাস নদী-তীরবর্তী মুসলমান চাষী জীবনের আচার-আচরণের প্রতীক কাদির মিয়া। সংস্কৃতিমনা মানের মানুষ কাদির মিয়া মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল, দরদী। সে কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী। সে উৎপাদিত কৃষিজাত ফসল বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। নিজের ক্ষেতে উৎপাদিত আলু এক দিন নৌকোয় করে বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে। নিজের ক্ষেতে উৎপাদিত আলু এক দিন নৌকোয় করে বাজারে বিক্রি করতে যাওয়ার পথে নদীর প্রবল স্রোতে ও ঝড়ে তা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়। পুত্র ছাদির ও কাদির মিয়াকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে বনমালী ও ধনঞ্জয়। বিক্রি করতে নেয়া আলু বাজারে সাজানোর সময় কাদির মিয়া ইচ্ছাকৃতভাবেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কতগুলো আলু দূরে সরিয়ে রাখে। এই আলুগুলো বাজারে আশ্রয় নেয়া অসহায় ছেলেগুলো কুড়িয়ে নেবে,

অসহায়দের প্রতি কাদির মিয়ার মনোভাব এ রকম। 'সাইত' করার আগে কাদিরের এ ধরনের বদান্যতা সব সময় ভালো লাগে না পুত্র ছাদিরের। এ প্রসঙ্গে কাদির বলে :

> বড় অভাগা এরা। কেউর মা নাই, বাপ নাই, লাথি ঝাঁটা খায়; কেউর মা আছে কিন্তু দানা দিতে পারে না। কেউর বাপ আছে মা নাই।[২১]

অবশ্য, মানুষের জন্যে কাদিরের এই মায়া-মমতা সম্পর্কে পুত্র ছাদিরও সন্তুষ্ট। কাদিরের সততা-ধর্মভীরুতার জন্যে গ্রামের মানুষও কাদির মিয়াকে সম্মান করে। বনমালী কাদির মিয়াকে মনে করেছে পয়গম্বর মহম্মদের পথের মানুষ। পয়গম্বরের মতো মানুষকে ভালোবাসে কাদির মিয়া, সে যেন সেই পয়গাম্বরের মহত্ত্বেরই একটুখানি পরশ লাভ করেছে। কাদির সম্পর্কে বনমালীর এই ধারণা কাদির মিয়ার চরিত্রকে করে তুলেছে মহানুভব। পারিবারিক জীবনেও কাদির অত্যন্ত স্নেহশীল। পুত্রবধূ খুশীর চোখের জল দেখে মনে পড়ে তার নিজ কন্যা জমিলার কথা :

> বেদনায় বুকটা টন্‌টন্ করিতে লাগিল ; মনে মনে বলির, মুহুরী যত দোষের দোষী না, তার চাইতে অধিক দোষী করিয়া আমরা এই অসহায় মেয়েটাকে সকলে মিলিয়া জর্জরিত করিতেছি। আমি যত দোষের দোষী না... শোনে আর চোখের জল ফেলে? ... জমিলা। সেও ... মা মরা মেয়ে।[২২]

এখানে একজন স্নেহশীল পিতার পরিচয়ই যেন ফুটে উঠেছে। কাদির মিয়া শক্ত নৈতিকতার মানুষ। সে বিয়াই নিজামত মুহুরীর ওপর ক্ষিপ্ত আর্থিক, লেনদেন শোধে তার অপারগতার জন্যে নয়; বরং ক্ষিপ্ত তার ঘোরানো-প্যাঁচানো আচরণের কারণে। এ ছাড়াও কাদির মিয়ার নৈতিকতায় আঘাত দিয়েছে মাগন সরকার। অবলীলায় সে কাদির মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা করে শিক্ষত মানুষদের রূপটিকে যেন বিষাক্ত করে তুলেছে কাদির মিয়ার কাছে। সে-কারণে তার ধারণা জন্মেছে, শিক্ষিত মানুষ মাত্রই মন্দ। তাই ছাদিরের ইচ্ছার বিরোধিতা করে কাদির মিয়া নাতি রমুকে স্কুলে পড়তে দিতে চায় না। ছাদির মনে করে দুনিয়ার হালচাল জানতে হলে লেখাপড়া করা দরকার; কিন্তু কাদির মিয়া তার বিয়াই নিজামত মুহুরীর মতো অনেক উদাহরণ দেখায়। সে বলে :

> ইশকুলে পাঠাইলে, তোর শ্বশুরের মত মুহুরী হইতে পারিবে আর শাশুড়ীর বিছানায় বউকে ও বউয়ের বিছানায় শাশুড়ীকে শোয়াইয়া দিয়া দূরে সরিয়া ঘুষের পয়সা গুনিতে পারিবে।[২৩]

সরল মানসিকতার জন্যেই সে যায় নি মামলা মোকদ্দমার পথে; সে মানুষকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। আত্মবিশ্বাসের জোরেই কাদির মিয়া মাগন সরকারকে জব্দ করে। মাগন ঠাকুরের ঘটে বীভৎস মৃত্যু। এই কাদির মিয়াকে আবার পাওয়া যায় উপন্যাসের শেষে, মালোদের দুর্দিনে। অনাহারী মালোদের জন্যে সে খুলে দেয় তার ধানের গোলা। কাদির মিয়া আবারও তার উন্নত চরিত্রের পরিচয় রেখেছে এই উদার কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

রামপ্রসাদ তার নিজ সমাজ-সংস্কৃতিতে দিয়েছে নেতৃত্ব। একটা সময় পর্যন্ত সে সফলতার সঙ্গে মালোদের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু তারপর মালোরা তার কথা আর শোনে নি। মালো সমাজের অভ্যন্তরীণ সঙ্কট ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মুখে রামপ্রসাদ উপস্থিত হয়। মালোদের জন্যে রামপ্রসাদের ছিলো দরদ; গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষার জন্যে সে গোপনে ঘুষ নেয় নি বাজার বসানোর প্রস্তাবকের কাছ থেকে। বরং ঘুষ প্রস্তাবককে সে পান-তামাকও দেয় নি। পক্ষান্তরে সে অন্য দলের কাছ থেকে প্রত্যেক জেলের জন্য পঁচিশ টাকা ও একটা করে ধুতি পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়।

সমাজ পরিবর্তনের ধারায় বদলেছে অর্থনীতি, বদলেছে জীবনের ছন্দ। ত্রিপুরার রাজাদের বছরে দশবার করে মাছ দিতে হতো প্রত্যেক মালোকে। এরপর চালু ছিল রাজ-সরকারে খাজনা পৌঁছে দেয়ার নিয়ম। কিন্তু এক পর্যায়ে দেখা গেল তিন বছরের খাজনা বাকি। এ দিকে গোকণঘাটের মালোদের কাছে খাজনা চায় আনন্দবাজারের লোকেরা। এমন পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে মালোদের মঙ্গল চেয়ে নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল রামপ্রসাদ। সে মনে করে, মালোরা মাছ বেচার জন্যে এর আগে কাউকে মাশুল দেয় নি, এখনও দেবে না। জায়গা দেয়া না-দেয়ার বিষয় নয়, মালোরা বাজার জমাতে ও ভাঙতে জানে। তারা যে দিকে যায় অ-পথ হয় পথ, অ-বাজার হয় বাজার। মালোদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এমন দৃঢ়তার সঙ্গেই কথা বলেছে রামপ্রসাদ।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ সাহসী ভূমিকা নিয়েছিলো। অশিক্ষিত পিছিয়ে পড়া মালো সমাজের রক্ষণশীলতা ভেঙে প্রগতির ধারা বইয়ে দিতে চেয়েছিলো সে। অশিক্ষা ও রক্ষণশীল ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে রামপ্রসাদ মালো সমাজে

পারে নি বিধবা বিবাহ চালু করতে। মালোদের পুরোহিত চক্রবর্তী ঠাকুর মনে করত বিধবা বিবাহের ফল নরকবাস। সে-কারণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথাই চালু থেকেছে সমাজে।

উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে রামপ্রসাদ তার নেতৃত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তিতাসের জল শুকিয়ে গেছে, চর পড়েছে তিতাসের বুক জুড়ে। তিতাসের জলে এক দিন মালোদের ছিলো একচ্ছত্র অধিকার। চর পড়ার কারণে তিতাস নদীর ওপর অধিকার হারাতে বসেছে মালোরা। জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মালোরা পড়েছে গভীর সঙ্কটে। এই সঙ্কট কাটিয়ে ভিন্নভাবে বাঁচার জন্যে চর দখলের প্রয়াস রামপ্রসাদের। জেলেরা চরের জমিতে কৃষি কাজ করবে, এ ধারণা তারই। মালো গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই তার এই প্রয়াস। এ জন্যে সে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে জেলেদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। রামপ্রসাদ বলেছে :

> ওরা কৃষক। ওদের জমি আছে। ওরা আরও দখল করিবে। এত দিন জল ছিল, আমাদের ছিল দখল। এখন জল গিয়াছে। তার মাটিও এখন আমাদেরই। ওরা অত-দূর হইতে আসিয়া দখল করিয়া নিবে, আর এত নিকটে থাকিয়া আমরা জেলেরাই বা নিশ্চেষ্ট থাকিব।[২৪]

রামপ্রসাদ গোষ্ঠী স্বার্থে, নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মালোরা তা অনুসরণ করতে পারে নি। তাদের মধ্যে অধিকার প্রতিষ্ঠার চেতনা হয় নি জাগ্রত। এটা রামপ্রাসাদের নেতৃত্বের ব্যর্থতাই নয় শুধু, তা মালো সমাজের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতাও। তবু রামপ্রসাদ একাই বের হয়েছে জমি দখল করতে। এবং লড়াই করতে করতে সে বরণ করেছে মৃত্যু।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উন্যাসের প্রধান চরিত্র বাসন্তী। একমাত্র বাসন্তীই এ উপন্যাসের প্রতিটি অংশে উপস্থিত থেকেছে। অন্যান্যরা-কিশোর-সুবল-অনন্তর মা-'জন্ম মৃত্যু বিবাহ' অংশে মৃত্যুবরণ করে। অনন্তকে নয়া বসতের আগে পাওয়া যায় না। উদয়তারা-রমু-খুশী-বনমালী রামধনু অংশ থেকে ক্রমে হাজির হয়। সমস্ত উপন্যাসে বাসন্তীর উপস্থিতি সব সময়ই লক্ষ্য করা যায়। বাসন্তীর মধ্য দিয়েই ঔপন্যাসিক মালোদের জীবনধারাটি ব্যাপকভাবে উপস্থাপনের সুযোগ পেয়েছেন। অনেক সময় মনে হয়, তিনি বাসন্তীর মাধ্যমে মালোদের জীবনধারার এক ধরনের প্রতীকী উপস্থাপনায় উৎসাহিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের একটি অংশ উদ্ধৃত ধরা যায় :

> সুবলার বউ নিজেও আর উঠিতে পারে না। পা টিপ্ টিপ্ করে। মাথা ঘোরে। চোখের সামনে দুনিয়ার রঙ আরেক রকম হইয়া যায়। সে ভাবিয়া রাখিয়াছে, সকলের যা গতি হইয়াছে আমারও তাই হইবে। তার জন্য ভাবিয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু ঘরে জল থাকা দরকার। শেষ সময়ে কাছে জল না থাকিলে নাকি ভয়ানক কষ্ট হয়।[২৫]

উপন্যাসের অন্তিম পর্যায়ে, মালোদের জীবন বিপর্যয়ের শেষ প্রান্তে এসে এ বক্তব্য থেকে তিতাসে জল শূন্যতাজাত ভয়াবহ পরিণতির ইশারা মেলে। তিতাস ও বাসন্তীর ধারাবিহিক উপস্থিতিতে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠে একটি পরিণতিতে পৌঁছেছে। বাক্যকালে বাসন্তীর মাঘমণ্ডপের ব্রত তৈরিতে অংশ নিয়েছিলো কিশোর ও সুবল। জলে ভাসানো চৌয়ারি ধরার জন্যে দুই ডানপিটে ছেলের দ্বন্দ্ব বেঁধে যায়। তাদের এ ঝগড়া-বিবাদ বাসন্তীকে কষ্ট দিয়েছে। বিশেষ করে বাসন্তী ব্যথিত হয়েছে কিশোরের জন্যে। এ প্রসঙ্গে বাসন্তী বলেছে :

> মা, ওমা দেখ, সুবল দাদা কিশোর দাদার কাণ্ড! আমি চৌয়ারির জলে ছাড়তে না ছাড়তে তারা দুই জনে ধরতে গিয়া কি কাইজ্যা। এ কয় আমি নিমু, হে কয় আমি নিমু। ডরে আর কেউ কাছেও গেল না। শেষে কি মারামারি।[২৬]

বাসন্তী তাদের এই কাড়াকাড়ি সইতে না পেরে দুজনকেই রাখতে বলেছে চৌয়ারি। কিশোর বাসন্তীর কথা মেনে নিয়ে ছেড়ে দেয় চৌয়ারি পাবার আশা। বাসন্তীর মনের কোণে সূক্ষ্ম দরদ লুকিয়ে ছিল কিশোরের জন্যে। প্রবাস খণ্ডে শুকদেবপুরে খলা বাইতে যাওয়ার সময় কিশোর ও সুবলের মধ্যে প্রেমভাব লক্ষ্য করা যায়। উভয়ে এ বিষয়ে আলাপ করেছে। সুবল ভেবেছে, বাসন্তী কিশোরের হাড়িতে চাউল রেখেছে।

কিন্তু কিশোরের মন রোমান্টিকতার পাখায় ভর করে উড়ে চলেছে অপ্রাণীয়ের খোঁজে। ফলে কিশোরের সঙ্গে বিয়ে হলো না বাসন্তীর। শুকদেবপুরে কিশোরের বিয়ে হলো অনন্তর মায়ের সঙ্গে, যাকে নিয়ে ফেরার পথে ডাকাত দলের কবলে পড়ে স্ত্রী ও অর্থ সবই হারালো সে। ফলে সে হারিয়ে ফেললো মানসিক ভারসাম্য। অন্য দিকে বাসন্তীর বিয়ে হলো সুবলের সঙ্গে। কিন্তু বিয়ের পর পরই সুবলের মৃত্যু ঘটে জিয়ল মাছের কাজ করতে গিয়ে। বাসন্তীর পরিচয় কালক্রমে দাঁড়ালো সুবলার বউ। সুবল আকৃষ্ট বাসন্তীর প্রতি, বাসন্তীর প্রেম কিশোরের জন্যে, কিশোর পাগল হলো অনন্তর মায়ের জন্যে, অনন্তর মা

অনুসন্ধানে রত পাগল হওয়া কিশোরের জন্যে, এ এক জটিল পরিস্থিতি। সে-কারণেই হয়তো বাসন্তী মুগ্ধ অনন্ত ও তার মায়ের প্রতি। বাসন্তী যেন কিশোর-সুবল-অনন্ত-অনন্তর মা সকলের সঙ্গেই নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত; কিন্তু বাস্তবে সে কাছে পায় না কাউকেই। তবু বাসন্তী তার মানসিক সবলতা ও পরিশ্রমী স্বভাব নিয়ে সুতো কেটে জীবিকা নির্বাহ করেছে। এবং একই সঙ্গে সে সমাজের ভাগ্য পরিবর্তনের দায়িত্ব অনেকখানি কাঁধে তুলে নিয়েছে। সে-কারণেই হয়তো মালো সমাজে নারীর কখনও কখনও হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট। কালোবরণের মা, উদয়তারা, অনন্তর মা এরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্ম বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র মহিমায় মালো পাড়ায় উজ্জ্বল।

কিশোরের প্রতি বাসন্তীর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে নি; প্রেমের শেষ আভাটুকু মিলিয়ে যায় কিশোরের উন্মাদগ্রস্ততায় এবং তা তার মনের গভীরে জ্বালিয়ে রাখে অন্তহীন বেদনার দীপশিখা। অন্যদিকে সুবলের সঙ্গে বিয়েতেও সুখী হয় নি বাসন্তী। একজনকে ভালোবেসে অন্য জনকে বিয়ে করার বিড়ম্বনা বেশি দিন অবশ্য সইতে হয় নি বাসন্তীকে। সুবল মারা গেছে জিয়ল মাছ ধরতে গিয়ে। সে মরণ ছিল বড় বীভৎস, ঝড়ের সময় ওনৌকার সঙ্গে তীরের আঘাত ঠেকাতে নদীতে নামলে সুবল একা নৌকোর গতি থামাতে পারে নি। ফলে তাকে পড়তে হয় নৌকার নীচে। স্বামীর মৃত্যু আর পূর্ব-প্রেমিকের উন্মাদ হওয়ার ঘটনার মাঝখানে পড়ে যেন অনেকটা নিস্তব্ধ হয়ে যায় বাসন্তী।

বাসন্তী বন্ধুবৎসল। সে-কারণেই সে মঙ্গলার বউয়ের চেয়েও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে অনন্তর মাকে সমাজভুক্ত করার ক্ষেত্রে। এবং অনন্তর মাকে সাহায্য করতে গিয়েই তার দ্বন্দ্ব হয় নিজ মায়ের সঙ্গে। অভাবই যেন তার নৈতিকতা টিকিয়ে রাখতে দেয় নি। অন্য পাড়ায় ময়নার সঙ্গে কথা বলা নিয়েও তার মায়ের সঙ্গে বাসন্তীর হয়েছে বিবাদ। এ প্রসঙ্গে বাসন্তী তার মাকে বলেছে :

> মনে কইরা দেখো কোন শিশুকালে বিয়া দিছিলা মইরা গেছে। জানলাম না কিছু, বুঝলাম না কিছু। সেই অবুঝ কালে ধর্মে কাঁচারাড়ি বানাইয়া থুইছে। সেই অবধি পোড়া কপাল লইয়া বনে বনে মাইগগা ফিরি। তোমরা ত সুখে আছ। তোমরা কি বুঝবা আমার দুঃখের গাঙ কত গহীন। আমার বুঝি সাধ আহ্লাদ নাই।[২৭]

এ যেন বঞ্চিত এক নারীর জীবন-বেদনার প্রকাশ। বাসন্তীর এই জীবনাগ্রহ, জীবন তৃষ্ণা থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে যে সমাজ, সেখানে বিধবা বিয়ের

প্রচলন ঘটাতে পারি নি রামপ্রসাদ। তার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হলো এক পর্যায়ে অনন্তর মা। সে-কারণেই অনেক ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে অনন্তর মাকে সাহায্য করেছে বাসন্তী। তবে বাসন্তীর এ সাহায্যের অন্তরালে মানবিক মূল্যবোধ এবং কিশোরের প্রতি তার ভালোবাসার প্রভাবও রয়েছে বলে মনে করা যায়। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> ...তা না হলে অনন্তকে ঘিরে এই সর্বরিক্ত নারীর বেঁচে উঠার আকাঙ্ক্ষা পুষ্ট হবার কোন অর্থ নেই।[২৮]

বাসন্তীকে ঔপন্যাসিক 'বিপ্লবী নারী' বলে উল্লেখ করেছেন। তার মন বিপ্লবী হতে প্রলুব্ধ হয়েছে বিদ্যমান সমাজকাঠামো বদলাতে। ফলে বাসন্তী হয় নি অনন্তর মায়ের মতো সংসারী। বাসন্তী জেগে উঠতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে অর্থনৈতিক শোষণমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। বাসন্তী হয়ে ওঠে গোকণঘাটের জনমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতিনিধি। বাসন্তী সুবলের জীবন দেখেই বুঝেছে, ধনীরা দরিদ্র মজুর-শ্রমিকদের প্রতি অনুকূল নয়। সে-জন্যেই হয়ত বাসন্তী বাইরের সংস্কৃতিতে হয়েছে অবিশ্বাসী ; 'বাজাইরা' সংস্কৃতি, চটুল যাত্রার প্রতি জন্মেছে তার ক্ষোভ। পাটনীপাড়ার অশ্বিনীর গান প্রথম দিন সহ্য হলেও দ্বিতীয় দিন তার অসহ্য মনে হয়েছে। বাসন্তী তাই বেরিয়েছে রণমূর্তি নিয়ে এবং সবার সামনে বলেছে :

> ইটা আমার বাপের দেশ ভাইয়ের দেশ, ইখানে আমি কারুকে ডরাইয়া কথা কই না। ইখানে আমারে যেজন আজ্‌নাইব, এমন মানুষ মার গর্ভে রইছে।[২৯]

বাসন্তীর এই বিদ্রোহী মনই এক দিন মালো পাড়ার মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি দেওয়া তেলিপাড়ার এক যুবককে দিয়েছে জীবনের শিক্ষা। তারই অনুপ্রেরণায় মালোর জোয়ান ছেলেরা তাকে মালো পাড়া ও ভদ্র লোকদের পাড়ার মধ্যে তৈরি হয় বিরাট দ্বন্দ্ব। মালোপাগ্‌ল সংস্কৃতি ভাঙার ষড়যন্ত্র শুরু হয় সে-দিন থেকেই। বাসন্তী এই গভীর সঙ্কটে মালোদের সংগঠিত করতে চেয়েছে, কিছু সংখ্যক মালো তার সঙ্গে একত্র হয়ে নিজ মালো গোষ্ঠীর মর্যাদা রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এক পর্যায়ে বাসন্তী ফিরে এসেছে আপন গৃহে মায়ের কাছে। সে যেন তার মাকে অধিকার করেছে নতুন করে। কিশোর, সুবল, অনন্তর মা, সন্তানতুল্য অনন্ত কেউ-ই তার আপন হলো না। অন্য দিকে সে ফেরাতে পারে না নিজ সংস্কৃতির ভাঙনও। যখন নদী শুকিয়ে মালোদের অস্তিত্ব বিপন্ন করলো, তখনও বাসন্তী

খুঁজেছে স্নেহ-বাৎসল্যের আশ্রয়। সে অনুধাবন করেছে নির্ভরতার আশ্রয় ছাড়া বাঁচা যায় না। এই অনুভবের কারণেই বাসন্তী আগ্রহী হয়েছিল অনন্ত-অনন্তবালার বিয়েতে অনন্তর মায়ের ভূমিকা গ্রহণ করতে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে বাসন্তী কিছুটা ব্যর্থ হলেও, তিতাস নদী মরে গেলেও, সে-দিনের সেই তিতাস ও তার তীরবর্তী মানুষের জীবন প্রবাহে বাসন্তীই হয়ে থাকলো সবচেয়ে স্মরণযোগ্য চরিত্র।

কাহিনীতে দীর্ঘ স্থান জুড়ে না থাকলেও উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে উদয়তারা। অনন্তকে ঘিরে উদয়তারার চরিত্রটি বেশি আলোচিত। বাসন্তী ও উদয়তারার মধ্যে মারামারি হয়েছে অনন্তকে নিয়েই। অনন্তর মায়ের এক ধরনের সংযত ও একমুখী ভাবভঙ্গির পাশে চঞ্চল, প্রগলভ নারী উদয়তারার উপস্থিত কাহিনীতে এনেছে বৈচিত্র্য। নবীনগরের বনমালীর বোন উদয়তারার স্বামীর বাড়ী গোকণঘাটা। সে তার এলাকায় সুপরিচিত কথায় কথায় ছড়া কাটে বলে। সে একই সঙ্গে জামাই-ঠকানী হিসেবেও পরিচিত। এ সব কারণে তাকে সমীহ করে মেয়েরা। তার আচরণের মধ্য দিয়ে মালো নারীদের নানা বৈশিষ্ট্য যেন দীপ্যমান। উদয়তারা সম্পর্কে এক জন সমালোচক বলেছেন :

> সব মিলিয়ে উদয়তারা হয়েছে এ উপন্যাসের লোক সংস্কৃতি তথা মৌখিক কৃষ্টিচক্রের মূর্তিমতী প্রতিনিধি।[৩০]

সন্তানহীন উদয়তারার মানসিক পরিবর্তন ঘটে অনন্তকে পাওয়ার পর। নবীনগরে তাকে ডাকতে এসে ব্যর্থ হয়েছে মেয়েরা। তার ভালো লাগে না কথায় কথায় শ্লোক কাটা। সন্তানহীনার বেদনা ঢাকতে উদয়তারার এ ছিল এক কৌশল। তার হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নৌকা বাইচের দিন অনন্তকে রক্ষার যুদ্ধে বাসন্তীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ার মধ্য দিয়ে। উদয়তারার এই কঠিন স্বভাবের ভেতর ছিল কোমলতাও। সে জন্যেই বাসন্তীর কাছে সহজে ক্ষমা চাইতে পেরেছে সে। তার কোমল চরিত্রের পরিচয় বনমালীর বিয়ে প্রসঙ্গেও দেখা গেছে। মালো সমাজে বিয়েতে পণ প্রথা চালু থাকায় আর্থিক সমস্যায় বনমালী বিয়ে করতে পারছিল না। বোনদের বিয়ে থেকে পাওয়া টাকা সমাজের লোকদের দাওয়াত খাওয়াতেই শেষ হয়ে গেছে। ফলে ভাইয়ের মাথায় 'সোলার মুকুট' না ওঠায় উদয়তারা ব্যথিত। সে-জন্যে সে তার মেজদির স্বামীর কাছে জানতে চেয়েছে তার কোন বান আছে কি না, যাতে করে কম পণে তার বিয়ে হতে পারে। উদয়তারা আসলে কঠোরে-কোমলে গঠিত এক নারী।

> অনন্তর মা উপন্যাসের একটি অন্যতম নারী চরিত্র। উপন্যাসে এ নারীর নাম নেই, ছেলে অন্তর মা হিসেবে সে তার পরিচয় লাভ করে। একজন সমালোচক এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সমাজ-মনই' অনন্তর মায়ের নামহীনতার কারণ বলে ভাবা যায়।[৩১]

প্রথম দর্শনেই প্রেমে আক্রান্ত হয়েছিল অনন্তর মা, কিশোরকে দেখে। নৃত্যরত মেয়েটির রূপে মুগ্ধ হয়েছিল কিশোরও, মেয়েটির তাল কেটে যায় তাকে দেখে। প্রথম দর্শনের সেই মুগ্ধতা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। দিন কয়েক পর তারা বিয়ে করতে চাইলে বাঁশিরাম মোড়লের স্ত্রী দু'জনের হাতে দুটো ফুলের মালা তুলে দিয়ে দেশে গিয়ে শাস্ত্রমতে বিয়ে করার পরামর্শ দেয়। মালা বদল করে গান্ধর্ব বিয়ের সুবাদে স্ত্রীকে নিয়ে কিশোর তার নিজ গ্রাম, গোকণঘাটের পথে যাত্রা করে। কিন্তু হাওরে ডাকাতের কবলে পড়ে সে হারিয়ে ফেলে তার স্ত্রী ও টাকা পয়সা। ফলে কিশোর পাগল হয়ে যায়। এরপর নদীর তীর থেকে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মালো উদ্ধার করে মৃতপ্রায় অনন্তর মাকে। তাদের মাধ্যমেও কোন নাম জানা যায় নি। দুঃখ-বেদনার মধ্যে বেড়ে ওঠা অনন্তর মা অপরিসীম ধৈর্যশীল। গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ মালোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অনন্তর মা যায় গোকণঘাটে। অচেনা, অজানা শ্বশুরালয়, সেখানে কেউ তাকে চিনবে না, জানবে না, যে চিনবে সে তখন উন্মাদ অবস্থায়। পাগল কিশোর যে তার স্বামী, সে-কথাও সঠিকবাবে জানা নেই তার। সে-দিনের হাঙ্গামার মধ্যে জানতে পেরেছিল কিশোরের গ্রামের নামটি কেবল। এ সম্বল নিয়েই তাকে যেতে হয়েছে স্বামীর ভিটায় বাস করতে। বাস্তবতার এ পটভূমিতে অনন্তর মায়ের জীবনাকাঙ্ক্ষা বলতে থাকে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। গোকণঘাটের নতুন বসতিতে কালোবরণের মা ও বাসন্তীর সহায়তায় সে কোনক্রমে টিকেও থাকে। সুতো কাটার কাজ শেখে সে বাসন্তীর কাছে। গ্রামের লোকদের কাছে সে পরিচিত হয় ধর্মভীরু মহিলা হিসেবে। পূজা-পার্বণে মন্দিরের পুরোহিতকে সে নানা ভাবে সাহায্য করে। গোকণঘাটে বাসন্তীকে আশ্রয় করেই অনন্তর মায়ের দিন কাটে। রূঢ় সমাজ-বাস্তবতার মধ্যে বাসন্তীই যেন তার একমাত্র সহযাত্রী। কিশোরকে ভালোবেসেছিলো বাসন্তী, তা তাকে ভুলতে হয় চিরতরে, আবার অনন্তর মাকে ভালোবেসেছিলো কিশোর, সে পাগল হয়ে গেলে এ ভালোবাসাও হয় ব্যর্থ। উত্তরায়ণ-সংক্রান্তির আগের রাতে রামকেশবের বাড়িতে তিনজন নারী পিঠা তৈরির কাজ করছিলো। পিঠা তৈরির অনুকূল আলাপে মেতে ওঠে দুজনেই। সঙ্গে থাকা মঙ্গলার বউ নিদ্রাভিভূত। আলাপের মাধ্যমে বাসন্তী বুঝতে পারে অনন্তর মায়ের পরিচয়,

অনন্তর মাও বুঝতে পারে কিশোর পাগলকে ভালো করার জন্যে তার মনে বাসনার কথা। দোল-উৎসবের দিন নিষ্প্রাণ রাধামাধবকে আবির না দেয় অনন্তর মা তাই আবির ছুঁড়েছিল পাগল কিশোরের দিকে। তার অন্তরের অদম্য ইচ্ছার কথা গোপন করে সে বলেছিল, পাগলেরে কেউ রাঙালো না, সে যেন তাকে রাঙিয়েছে। এ প্রসঙ্গে নারীর জন্যে পুরুষ মানুষ দরকার বলে বাসন্তী অনন্তর মায়ের কাছে রসিকতা করলেও, তা আবার মিলিয়ে যায় অনন্তর প্রতি মাতৃত্বের প্রবল টানে। দুই নারীই মনে করে:

> পুরুষ মানুষ দিয়া কি হইব। তারা বৃষ্টির পানি-ফোঁটা, ঝরলেই শেষ। তারা জোয়ারের জল। তিলেক মাত্র সুখ দিয়া নদীর বুক শুইষ্যা নেয়। এই অনন্তই আমরার আশা-ভরসা। দুই জনে এরেই মানুষ কইরা তুলি চল। এ একদিন আমরার দুঃখ ঘুচাইব।[৩২]

পাগলকে আবির মাখানোর মধ্য দিয়ে অনন্তর মা তার পূর্ব স্মৃতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। সে জানে, প্রিয়জন হারানোর কারণে যে পাগল হয় সে-প্রিয়জনকে ফিরে পেলে সুস্থ হয়ে ওঠে। এ কারণে অনন্তর মা পাগলকে সুস্থ করার জন্যে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেছে যা মনোবিজ্ঞান সম্মত। পরের বছরও দোল-উৎসবের দিন অনন্তর মা পাগলকে আবির মাখিয়ে পরিচর্যা করেছে ; ফলে সে প্রায় ফিরে এসেছিলো জীবনের স্বাভাবিক ছন্দে। কিন্তু মানুষের হৃদয়হীনতার কারণেই তা ব্যর্থ হয়। কিশোরের মৃত্যুর পর অনন্তর মা-ও চারদিনের ব্যবধানে মৃত্যুবরণ করে। যেন এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা ছিল দুজনের জন্যে একই পরিণতি।

বিভিন্ন নামে যার পরিচিতি এ উপন্যাসে তার নাম খুশী। রমুর বা, ছাদিরের স্ত্রী, নিজামত মুহুরীর মেয়ে, কাদিরের পুত্রবধূ— এতগুলো তার পরিচয়। এ চরিত্রটি অদ্বৈত মল্লবর্মণের দেখা স্বচ্ছল মুসলমান গৃহবধূর। খুশীকে ঔপন্যাসিক যেন হঠাৎ আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন।

নিজামত মুহুরী যৌতুকের টাকা পরিশোধ করতে পারে নি বলে, সে গোপনে দেখতে আসে মেয়েকে। সে দিনই বেয়াই কাদির মিয়া সংবাদ পেলো যে তার নামে মাগন ঠাকুর মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। পিতা-পুত্র কাদির মিয়া ও ছাদির মিয়া সে বিষয়ে ঘরে বসে আলাপ করছিল। নিজামত মুহুরী ও মাগন ঠাকুর শিক্ষিত হলেও দুষ্ট প্রকৃতির। এ কারণে, কাদির মিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে ঠিক করেছে যে, নাতি রমুকে স্কুলে পড়তে দেবে না। সে-সময় উপস্থিত নিজামত মুহুরী কাদির

মিয়াকে অযাচিতভাবে এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তার কথা কাদির মিয়া শুনতে নারাজ। পরে দু'জনার মধ্যে শুরু হয় কথা কাটাকাটি। বাপের অপমানজনক অবস্থা দেখে খুশী বলে বসে :

> সাধে কি লোকে বলে পরের ঘর। পরের ঘরই ত। যে ঘরে আসিয়া বাপ হয় চোর, আর নিজে হয় বিষমুখী, সে-ঘর কি আপন ঘর।[৩৩]

খুশীর আক্ষেপ শুনে কাদির মিয়া ভাবে, তার নিজের মেয়েও যদি স্বামীর বাড়িতে এমন অবস্থায় পড়ে তা হলে সেও একই রকম কষ্ট পাবে। খুশীর কথায় কাদির মিয়া যেন সংবিত ফিরে পেয়ে প্রশ্ন করে নিজেকে। কি করে এ ঘর তার পরের ঘর। রাত পোহাতেই বিশটি গরুর গোয়াল সাফ করা, খাবার খাওয়ানো, ঝাঁট দেয়া, উঠোন-বাড়ি পরিষ্কার করা, পানি তোলা, রান্না করা, সবার খাবার পরিবেশন করা, ধান শুকানো, ধান ভানা প্রভৃতি হাজারও কাজ করেও কিনা পরের বাড়ি, পরের বাড়ির মেয়ে। কাদির মিয়ার এ মনোভাব জানতে পেরে খুশী হয় আনন্দিত। আবেগে কেঁদে ফেলে সে। এভাবেই সে যেন এক ধরনের স্বীকৃতি পায় তার শ্বশুর বাড়িতে। দুই পরিবারের সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব মূলত দুই ব্যক্তির দ্বন্দ্ব। কাদির মিয়ার উপলব্ধির মাধ্যমে তা যেন পৌঁছে যায় এক মীমাংসায়। স্পষ্টবাদী খুশীর অন্য রূপও লক্ষণীয়। এক দিন গোয়াল ঘর থেকে গোবর ফেলতে যাওয়ার সময় রমু ও অনন্তকে এক সঙ্গে খেলতে দেখে সে গাছ থেকে শস্য পেড়ে তাদের দিয়েছিল। কর্তব্য পালনে ও সেবা প্রদানে একই মাত্রায় সতর্ক খুশী। একই সঙ্গে সে মাতৃস্বভাবা ও আত্মমর্যাদা সচেতনও। খুশী বাংলার চিরকালীন গৃহবধূর প্রতিনিধি যেন।

তিতাস নদীর তীরে বসবাসরত এক মুসলমান পরিবারের শান্ত স্বভাবের নারী জমিলা। উপন্যাসের প্রথম দিকেই দেখা যায় জমিলার উপস্থিতি। এক দিন সে তার স্বামীর সঙ্গে ভাড়া করা নৌকোয় বাপের বাড়ি থেকে আসছিলো। নৌকা থেকে নেমে সাপের ভয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে ভয় পাচ্ছিল জমিলা। জমিলার আশঙ্কার কথায় মাঝি ও তার স্বামী চুপ করে থাকে। কিন্তু তার স্বামী ছমির মিয়ার মনে আনন্দ। খুশিতে মাঝিকে সে নির্ধারিত ভাড়ার চারগুণ দেয়, যদিও সে হিসাবী লোক। এটা দেখে জমিলা ভাবে, বড় ভালো লোক তার স্বামী। বস্তুত, চরিত্রের সরলতাই জমিলার বৈশিষ্ট্য। সে নদীর ঘাটে অপরিচিত উদয়তারাকে দেখে মুগ্ধ হয়। এক দিন কাছে পেয়ে জমিলা তাকে আপন করে নেয়। আনন্দে আত্মহারা হয় জমিলা। সে তার ভাবীকে বলে, উদয়তারা যেন তার

বহু জনমের চেনা। জমিলার এই সহজ-সরল জীবনভঙ্গি উদয়তারাকে আশ্চর্য করে। সরল স্বভাবের নারীদেরই এক প্রতিনিধি যেন জমিলা।

অনন্তবালার জীবনে বাল্য প্রেম সূচিত হয়েছিল অনন্তকে দেখে। কিন্তু অনন্তর কাছ থেকে সাড়া না মেলায় সে প্রেম আর পথ খুঁজে পায় নি। পেলে, হয়তো অনন্তবালাই হয়ে উঠতো 'তিতাস একটি নদীর নাম'—এর নায়িকা চরিত্র।

নবীনগরের কাছে সাদকপুর গ্রামে মনসা পূজার দিন অনন্ত ও অনন্তবালার পরিচয় ঘটে। পূজার স্থানে মনসার মূর্তির দু'পাশের অনেক শাপলা ফুল থেকে কিছু কুড়িয়ে দিয়ে অনন্তবালা মালা গেঁথেছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখে অনন্তবালা এক সময় অনন্তর গলায় পরিয়ে দিয়েছে সে মালা। অনন্ত নিমেষে গলা থেকে খুলে নিয়ে সেটি জড়িয়ে দিয়েছে অনন্তবালার খোঁপায়। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাওয়া এ মালাবদলের কথা অনন্তবালা ভোলে নি কোন দিন। অনন্তবালার প্রেমানুভূতি অনন্তকে আশ্রয় করেই যেন সজীব থেকেছে সর্বক্ষণ।

অনন্তবালা ও অনন্তর মধ্যে পার্থক্য অনেক; অনন্ত কথা বলে কম, সে পর্যবেক্ষক ও শ্রোতা। প্রতিটি মানুষকে সে যেন গভীরভাবে অবলোকনের শক্তি রাখে। অন্য দিকে অনন্তবালা কথা বলে বেশি। অনন্তর কেউ নেই, মাসী ছাড়া। অনন্তবালার রয়েছে মা, বাবা, অনেক আত্মীয়। সকলেরই আদরের পাত্রী সে। অনন্তবালা অল্প বয়স থেকেই শ্লোক-ছড়া কাটতে শিখেছে। অনন্তবালা গভীর মুগ্ধতা নিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে অনন্তকে চলে যেতে বলেছে অন্যত্র। কিন্তু অনন্তর নেই চালচুলো। সুতরাং ঐ ধরনের প্রস্তাব বিবেচনার প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য, অনন্তবালার ধারণা, মানুষ মানুষকে নিয়ে যায়। অবশেষে অনন্ত তাকে মেলায় নিয়ে যেতে রাজী হয়েছে। গামলায় চড়ে মানুষকে যেতে দেখে অনন্ত ভাবে ওরকম একটা গামলা হয়তো আনা যেতো। অনন্তর এ কথায় অনন্তবালা বলেছে :

> তুমি একলা পারতা নাকি, জিগাই? তুমি ঐ লোকটার মতন চালাক, না চতুর? বৈঠা হাতে লইয়া চাইয়া থাকবা দৌড়ের নাওয়ের দিকে, আর কোন্‌খানের কোন্ যাত্রিকের নাও দিবে ধাক্কা। ঠুনকো গামলা ভাঙলে তখন কি হইব। তুমি আমি দুইজনে থাকলে কোন ডর নাই; তুমি যখন একদিকে চাইয়া থাকবা, গামলারে আমি তখন সামলামু। আর গামলা যদি ভাঙ্গা যায়, তখন তুমি আমারে সামলাইও, কেমুন?[৩৪]

এ যেন কৈশোরে কাব্যিক নির্ভরতা। হয়তো কোন দিন এমনটি হওয়ার নয়; তবু মধুময় এক স্বপ্ন দেখা। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ ও শৈবলিনীর বাল্যপ্রেমও যেন এ ভাবেই সূচিত হয়েছিল। তবে, অনন্ত ও অনন্তবালার এ বাল্য প্রেমানুভূতি প্রতাপ-শৈবলিনীর মতো বিকশিত হয়ে তীব্রকার ধারণ করে নি। অভিভাবকদের আগ্রহীনতার কারণে অনন্তবালার স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত থকে নি। শুধু এক ধরনের মুগ্ধতার মধ্যে সময় কেটেছে অনন্তবালার। কিন্তু, অনন্ত নিজে ধাবিত হয়েছে অন্যদিকে :

> তারপর আসিল যুক্তাক্ষর। এগুলি কঠিন এবং জটিল। কিন্তু এই কঠিনতায় জটিলতায় যে একটা মোহ আছে, অনন্তকে তাহা পাইয়া বসিল। তারা নতুন নতুন রূপ নিয়া তার মানসলোকে আপন থেকে আসিয়া ধরা দিতে লাগিল।[৩৫]

জীবনদৃষ্টির এই পার্থক্যই জীবনে তাদের স্থায়িভাবে একত্র হতে দেয় নি। একজন সমালোচক বলেছেন :

> প্রকৃতি আর সংস্কৃতি-র দ্বন্দ্বটি অনন্তবালা-অনন্তর মধ্যে দেখানো যেত। অদ্বৈত সে দিকে বেশি হাঁটেন নি। তাই লিখছিলাম চরিত্রটির সম্ভাবনা সমস্তটুকু নিষ্কাশিত করেন নি লেখক।[৩৬]

অনন্তবালার আত্মীয়রাও চেয়েছিলো অনন্তর সঙ্গে তার বিয়ে দিতে। কিন্তু কোনভাবেই তারা ধরে রাখতে পারে নি অনন্তকে। আসলে এ ধরনের একপক্ষীয় প্রেম কোন দিশা পায় না। অনন্তবালার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। তা সত্ত্বেও অনন্তবালা তার অনুভূতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে নি। কুমারী অনন্তবালা অনন্তর প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট থেকেই বাপের হাত ধরে চলে গেছে কলকাতায়। এরপর থেকে অনন্তবালার আর কোন খবর মেলে নি। তবে, তার জীবনে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে থাকলে লেখক নিশ্চয়ই তার উল্লেখ করতেন।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাস নদীর তীরবর্তী বহু সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ কাহিনীতে ভূমিকা পালনে কেউ মুখ্য, কেউ গৌণ, কেউ কেউ কিছু দূর পর্যন্ত থেকেছে উপন্যাসের প্রবাহের সঙ্গে; কেউ কেউ আবার এক বার এসেই চলে গেছে চিরতরে। কিন্তু তাই বলে কোন চরিত্রকেই অহেতুক গণ্য করা যায় না। বিজয় নদীর তীরবাসীদের দুঃখের সাক্ষী গৌরাঙ্গ ও

নিত্যানন্দ মালো। পরবর্তীতে এ একই নামের দুই মালো-জেলের ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল অনন্তর মা। ডাকাতের কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিশোরের স্ত্রী সেদিন যদি ঐ দুই বৃদ্ধের কাছে আশ্রয় না পেতো, তা হলে উপন্যাসের কাহিনী হয়তো অন্য ধারায় প্রবাহিত হতো। করমালী ও বন্দালীর মতো কৃষক-মজুরের জীবনচিত্র আমাদের ব্যথিত করে। নৌকা বাইচের উৎসবে উপন্যাসকে দিয়েছে এক ভিন্ন মাত্রা। বাঁশিরাম মোড়লের বাড়িতে জাগ্রত কিশোরের প্রেমের ভুবন ডাকাতের হাতে পড়ে ধ্বংস না হলে কিশোর-নির্ভর কাহিনীটি অন্য মাত্রায় বিকশিত হতে পারতো। বনমালী ও ধনঞ্জয় না থাকলে বাঁচতো না কৃষক কাদিরের আলুর নৌকা। অনন্ত বনমালীর মাধ্যমেই নবীনগরে উদয়তারার আশ্রয়ে পৌঁছতে পেরেছিল। সেখানেই তার সঙ্গে দেখা হয় অনন্তবালার। তবে, সেখানে আঁটকে থাকে নি অনন্ত। সে উচ্চ শিক্ষার আশায় চলে যায় কুমিল্লা শহরে। মহাজন রশিদ মোড়ল, মাগন ঠাকুর, বিধুভূষণ পালের শোষণে মালোরা কিভাবে নিঃস্ব হয়েছে তার চিত্র ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। বাসন্তীর সঙ্গে মোহন যে পাড়ায়-মহল্লায় জনমত গড়ে তোলার কাজে অংশ নিয়েছে, তা এ উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট চিত্র। আরও অনেক ছোট খাট চরিত্র এ উপন্যাসে পালন করেছে নানা ভূমিকা। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাঁশিরাম মোড়ল, তিলক চাঁদ, মঙ্গলার বউ, কৃষ্ণচন্দ্র, দয়াল চাঁদ, ভারত, রামকেশব, কালোবরণ, গুরুদয়াল, শ্যামাসুন্দর, নন্দর মা, বিপিন, ময়না, রামদয়াল, রাধাচরণ মালো প্রমুখ।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাস তীরের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যসমূহের মাধ্যমে মালোদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশ-বেদনা, মোট কথা তাদের ধ্বংসের বিস্ময়কর কাহিনীর সঙ্গে যে সব সফল চরিত্র উপস্থাপনা অদ্বৈত মল্লবর্মণ করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান চরিত্র তিতাস নদী। তিতাস নদীকে এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বলা যায়। তিতাসকে কেন্দ্র করেই এ উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি চরিত্র বিকাশ লাভ করেছে। বস্তুত, সাধারণভাবে তিতাস ছাড়া কোন চরিত্রই বিকশিত হয় নি। এর কারণ বিশেষ কোন চরিত্র সৃষ্টির জন্যে লেখকের এ লেখা নয়। তাঁর উদ্দেশ্য তিতাস তীরবর্তী মানুষের জীবনালেখ্য রচনা করা। সে জন্যেই কিশোর, বাসন্তী, অনন্তর মা, অনন্ত, অনন্তবালা কেউ-ই উপন্যাসে সম্পূর্ণ বিকশিত হয়নি। লেখক তাদের তিতাসের বহমান ধারা সঙ্গে একীভূত করে দেখতে চেয়েছেন। যত দিন তিতাস নদী ছিল গতিশীল তত দিন তিতাস-তীরের মানুষের ছিলো প্রাণপ্রাচুর্যে উদ্দাম। এক সময় তিতাসের বুক চিরে জেগে ওঠে মাটির ঢিবি। প্রায় একই সময় তিতাস-তীরের বাসিন্দারা হয়ে যায় উদাসীন,

অন্যের সংকর সংস্কৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে নিজ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি যায় ভুলে। তিতাস-তীরের মানুষের জীবন তিতাস ছাড়া অচল বলেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে তিতাস নদী পালন করেছে উল্লেখযোগ্য চরিত্রের ভূমিকা।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর তীরবর্তী মালো-জেলেদের কর্ম-ধর্ম-স্বপ্ন-সংস্কৃতিভিত্তিক জীবন নিয়ে রচিত। শুধু এ অঞ্চলের মানুষের কাহিনী এবং তার সীমার মধ্যেই সেটি আবদ্ধ থেকেছে। এমনকি কাহিনীটি নিকটস্থ কুমিল্লাতেও বিস্তৃত হতে পারে নি। সে-কারণে, উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে একটি অঞ্চলভিত্তিক। সেদিক থেকে বলা যেতে পারে 'তিতাস একটি নদীর নাম' একটি ভৌগোলিক অঞ্চল নির্ভর হয়ে সূচিত ও বিকশিত হয়েছে। ঐ অঞ্চলের অখণ্ডতা কাহিনীর কোন পর্যায়ে খণ্ডিত হয় নি। উক্ত অঞ্চলের বাইরের মানুষ ও প্রকৃতির ব্যাপক কোন খোঁজ খবরও উস্থাপিত হয় নি এ রচনায়। উপন্যাসটির নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসরের মধ্যে থেকে উপন্যাসের চরিত্রগুলো নিয়ত সংগ্রামশীল থেকেছে বেঁচে থাকার জন্যে। চলমান জীবনে তাদের দুঃখবহ পরিণতি রচনার কুশলতায় গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে সর্বজনীন। এ সব বৈশিষ্ট্যের আলোকে 'তিতাস একটি নদীর নাম'কে অনেকে আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন ঃ

> তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ মহাকাব্যিক ব্যঞ্জনায় যে জীবনকে অঙ্কন করেছেন, সে জীবন নগর-কেন্দ্রিক মধ্যবিত্ত-মানসের অভিজ্ঞতা-বহির্ভূত। তিতাস-বিধৌত জনপদের স্থনিক বর্ণিমার সঙ্গে সে অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার বিশ্বস্ত রূপায়ণসূত্রে এ উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস-সাহিত্যে এটি একটি কালজয়ী সংযোজন।[৩৭]

একটি আঞ্চলিক উপন্যাসে কাহিনীর একটি অঞ্চল-ভিত্তিক নির্ভরতা থাকে অপরিহার্যভাবে। এ বিষয়ে একজন সমালোচক বলেছেন :

> কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের অনুপুঙ্খ— সেই অঞ্চলের মানুষের পেশাগত বৈশিষ্ট্য আর ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের পরম্পরিত সম্পর্ক। আসলে ভৌগোলিক পরিবেশ আর মৌলিক বৃত্তির লোকায়ত মানুষ— এরই টানাপোড়নে নিখুঁতভাবে বিন্যস্ত হয় আঞ্চলিক উপন্যাস।[৩৮]

আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও একজন সমালোচক জানিয়েছেন:

> A regional writer is one who concentrates much attention on a particular area and uses it and the people who inhabit it as the basis of his or her stories. Such a locale is likely to be rural and or provincial.[৩৯]

শুধু কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে কোন অঞ্চলের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য উপন্যাসে উপস্থাপন করা একজন লেখকের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অবস্থানের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা যদি লেখকের কল্পনা ও অনুভূতির সঙ্গে সসমন্বিত হয়, তা হলে জন্ম, নিতে পারে একটি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। অদ্বৈত মল্লবর্মণের ক্ষেত্রে প্রায় এমনটি ঘটেছে বলা যেতে পারে। মালোর সন্তান অদ্বৈত তিতাস পাড়ের মালো জীবনের সঙ্গে আজন্ম সম্পর্কিত। মালোদের জীবনের বঞ্চনা ও যন্ত্রণার সঙ্গে সুপরিচিত বলেই অদ্বৈতের পক্ষে এ ধরনের একটি উপন্যাস লেখা সহজতর হয়েছে।

> একটি আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পটভূমির সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গ সংশ্লিষ্টতা। তিতাস নদীর উৎসস্থল ও মোহনার মাঝামাঝি সাদকপুর থেকে নবীনগর, গোকণঘাট, আমিনপুর, বিরামপুর, ভৈরববাজার, নয়াকান্দা, শুকদেবপুর, উজানীনগর পর্যন্ত বিস্তৃত নদীর প্রবাহ-পথই এ উপন্যাসের নির্বাচিত ভৌগোলিক পরিবেশ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা আছে যে, 'ঝড়-তুফানের রাতেও' তিতাসের বুকে মাছ ধরতে যাওয়া স্বামীপুত্রদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয় না স্ত্রীরা, মায়েরা। কারণ, তিতাস প্রকৃতিতে শান্ত।[৪০]

এ ভৌগোলিক পরিসরে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীর জীবন তিতাস নদী ও তার আচরণের বাইরে খুব একটা যায় নি। এ উপন্যাসের কাহিনী গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রথাগত সাংগঠনিক কাঠামো অনুসৃত হয় নি বললেই চলে। তিতাস-তীরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েই যেন উপন্যাসটি তৈরি করা হয়েছে। লেখক যেন প্রকৃতির মতো ভ্রূক্ষেপহীনভাবে তাঁর চিত্রগুলো সাজিয়ে গেছেন। তবে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার প্রতিবেশের সঙ্গে উপন্যাসের মূল সুরের রয়েছে সুগভীর ঐক্য।

উপন্যাসটির কাহিনী বা ঘটনার সূত্রপাত ঘটে পূজব্রত কেন্দ্র করে ; দিননাথ মালোয় মেয়ে বাসন্তীর 'মাঘমণ্ডলের ব্রতে' চৌয়ারি বানানো এবং ভাসানো নিয়ে। এ পূজার মাধ্যমে কুমারী মালোর কন্যারা উপযুক্ত বর প্রার্থনা করে। কিশোর ও সুবলের মাধ্যমে তৈরি হয় বাসন্তীর চৌয়ারি। তা কেন্দ্র করেই দুরন্ত দুই বালকের অনুরাগ জন্মে বাসন্তীর প্রতি। কুমারী কন্যাদের জন্যে চৌয়ারি ব্যবস্থার মাধ্যমে বর প্রার্থনা জেলেদের রীতি। শত দুঃখবেদনার মধ্যেও তারা তাদের এ উৎসব-অনুষ্ঠান করে থাকে। এখানে এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির ঘটে স্বাভাবিক যোগাযোগ। এর মধ্য দিয়েই সূচিত হয় কিশোর, সুবল ও বাসন্তীর ভবিষ্যতের জীবনবোধ। কিশোরের প্রতি বাসন্তীর অনুরাগ প্রকাশ পায় তার কথায়। সুবলের মধ্যেও কিশোর ও বাসন্তীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ সম্পর্কিত ধারণা বদ্ধমূল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে বাসন্তী ও সুবলের বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণ করে কিশোর।

শুকদেবপুরে অবস্থান করার মধ্যে যেন কিশোরের জীবনবোধের পরিবর্তন ঘটে। সেখানে 'খলা' বাইতে যাওয়া-আসার পথের নদী-প্রকৃতির বহু বিচিত্র রূপ কিশোর-সুবলের জীবনের সঙ্গে যেন নিবিড়বাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। নদী পথেই তারা সেখানে উপস্থিত হয়েছে। নদীকে অবলম্বন করেই যেন কিশোর লাভ করেছে সুন্দরী নর্তকী স্ত্রী। আবার নদী পথেই ডাকাত হরণ করেছে তার স্ত্রী ও অর্থ। নদী পথ অথবা নদীনির্ভর জীবন প্রায়ই ঝুঁকিপূর্ণ। মেঘনার যে মোহনায় তারা বিপদগ্রস্ত হলো সেটিও বিপদসঙ্কুল। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা আছে :

> মোহনাটি সত্যই ভয়ঙ্কর। এপার হইতে ওপারের কূল-কিনারা চোখে ঠাহর করা যায় না। হু হু করিয়া চলিতে চলিতে স্রোত এক একটা আবর্তের সৃষ্টি করিয়াছে। দুই ধারের স্রোত মুখোমুখি হইয়া যে ঝাপটা খাইতেছে, তাহাতে প্রচণ্ড শব্দ করিয়া জল অনেক উপরে উঠিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।[৪১]

নদীই যেন বাসন্তীকে ভাসিয়ে এনেছে সুবলের কাছে। আবার সে-নদীই কেড়ে নিয়েছে তার প্রাণ। নদীর উত্থান-পতনের ঢেউ-ই যেন সুখ দেয় নি বাসন্তীকে। স্বামীর মৃত্যুতে তাকে আজীবন থাকতে হয়েছে বিধবা। নদীই তার দুঃখের মূল।

চার বছর পর কিশোরের স্ত্রীর অনন্তসহ গোকণঘাটে ফিরে আসা এ উপন্যসের উল্লেখযোগ্য বাঁক। নদীর সঙ্গে এমন সাক্ষাৎ না ঘটলে গোকণঘাটের

কঠিন বাস্তবতা তাকে করত না স্পর্শ। সুতো কাটার কাজ করে তাকে করতে হতো না জীবিকা নির্বাহ। উপন্যাসে আঞ্চলিকতা প্রসঙ্গে জীবন বাস্তবতার এ দৃষ্টান্ত অনেকটা যথার্থ। একইভাবে বিবেচনাযোগ্য গোকণঘাটে অনন্তর মায়ের স্থায়ী বসতি হওয়া। এ বিষয়ে বলা আছে :

> অবশেষে উঠিল অনন্তর মার কথা। তার বুক দুর দুর করিতে লাগিল। এ কথাটাও ভারতকেই তুলিতে হইল, নতুন যে লোক আসিয়াছে, আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন। তারে নিয়া কিভাবে সমাজ করিতে হইবে আপনারা বলিয়া যান। তারে কার সমাজে ভিড়াইবেন, কিষ্ট কাকার, না দয়াল কাকার, না বাসন্তীর বাপ কাকার ...রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, 'কারে কারে লইয়া তোর সমাজ?' 'সুবলার শ্বশুর আর কিশোরের বাপেরে লইয়া'। 'তা হইলে নতুন মানুষ লইয়া তোর সমাজ হইল চাইর ঘর'। 'হ কাকা[৪২]।

শুধু মালোরাই নয়, তিতাস তীরের মুসলমানদের জীবনের সঙ্গেও নদীর সংযুক্ত গভীরভাবে। তিতাসকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনও আবর্তিত। কাদির মিয়া-ছাদির মিয়ার মাধ্যমে সে নির্ভরশীলতার চিত্র ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য আলু বাজারে নেয়া হয় নদী পথেই। সে-সময়ের তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদীর ছবি উপন্যসের উপস্থাপিত হয়েছে বাস্তবভাবে। জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের ক্ষেত্রে মালো-সমাজের নিয়ম-নীতি, ধর্মাচার, এমনকি মায়ের মৃত্যুর পর সন্তানের হবিস্যি পালনের প্রথাও উপন্যাসে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। শুধু গোকণঘাট নয়, নবীনগরের মানুষের জীবনাচারের নানা প্রসঙ্গও উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসের এ পর্যায়ে। একটি এলাকার নানাবিধ বিবরণ ও চিত্র থাকায় 'তিতাস একটি নদীর নাম' আঞ্চলিক উপন্যাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উপন্যাসের 'রাঙা নাও' পর্বে স্থানীয় পরিবেশ আরও ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। নৌকা বাইচ একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এর সঙ্গে জড়িত কাঠ-সংগ্রাহক, করাতি, মিস্ত্রী, নকশাকার প্রভৃতি। প্রতিযোগীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বাউল-ভাটিয়ালি গায়কদের আবেগময় উচ্ছ্বাস তিতাস তীরবাসীদের জীবনে আনন্দ সঞ্চারক। কাহিনীর এক পর্যায়ে নদীই কাছে এনে দিয়েছে অনন্ত ও অনন্তবালাকে, তৈরি করেছে রমু ও অনন্তর বন্ধুত্ব। অনন্তবালা গড়তে চেয়েছে অনন্তর সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক আনন্তর জীবনে নদী এসেছে বার বার নদীর বাঁকের মতোই। অনন্ত নদী পথেই গোকণঘাট এসেছিল। এখানে মা মারা যাওয়ার পর নদীর আশে-পাশে ঘুরে ফিরে অনন্ত সঙ্গী হয় উদয়তারা ও বনমালীর। তাদের সঙ্গে নদীপথে নবীনগর আসে সে। এখানে

এসেই সে যেন পায় তার জীবনের সঠিক ঠিকানা। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর নাপতানির পরামর্শে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কুমিল্লা শহরে চলে যাওয়ার পেছনেও যেন নদী থেকেছে ক্রিয়াশীল। এ উপন্যাসে একমাত্র অনন্তই তিতাস পরিধির বাইরে গেছে, অন্য সব চরিত্র থেকেছে তিতাস নদীর আওতায়।

মালো সম্প্রদায় এতই প্রকৃতি-নির্ভর এবং সেই অর্থে অসহায় যে, তিতাসই যেন তাদের ঈশ্বর। তিতাসের বুকে চর জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মাছ ধরার পথ বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ হয়ে যায় তাদের অর্থ উপার্জনের উৎস। তাদের ক্ষুধা আছে, কিন্তু তা নিবৃত্তির বিকল্প কোন পথ নেই তিতাসে মাছ ধরা ছাড়া। ফলে দ্রুত তাদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। সঙ্গত কারণেই, এ উপন্যাসের কাহিনীতে 'তিতাস' নদী পালন করেছে বড়ো একটি ভূমিকা। এই ভূমিকাকে আশ্রয় করে প্রাধান্য লাভ করেছে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য। এ কারণে একজন সমালোচক বলেছেন :

> ...আঞ্চলিক জীবনের সরল ও নিপুণ বিন্যাসে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে অসাদারণত্বে ভাস্বর।[৪৩]

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের একটি অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর ভাষা। আজন্ম পরিচিত জীবন ও পরিবেশের ঘটনাবলি যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে তিতাসকেন্দ্রিক মালোদের নিত্য ব্যবহৃত বাসা থেকে গৃহীত ও সুপ্রযুক্ত শব্দাবলীর মাধ্যমে। গ্রন্থটি মূলত সাধু গদ্যে লিখিত হলেও সাধু রীতির সঙ্গে মাঝে মধ্যে চলিত রীতির গদ্যও লেখক ব্যবহার করেছেন। একই সঙ্গে তিনি আঞ্চলিক ভাষারও আশ্রয় নিয়েছেন। ভাষা ব্যবহারে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে ঔপন্যাসিক পরিচয় দিয়েছেন বাস্তবতাবোধের। সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণের কারণে উপনাসে মেলে মিশ্র ভাষা রীতি। এর ফলে 'তাহাকে'-র স্থানে 'তাকে', 'কাহারও' স্থানে 'কারো' 'যাহাকে'-র স্থানে 'যাকে', 'তাহার' স্থানে 'তার' দেখা যায় উপন্যাসটির প্রায় সবখানে। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি উদাহরণ থেকে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা যাবে :

> ক. এই কালকের থেকেই যেন আজ **তাকে** অনেকখানি বড় দেখাইতেছে।[৪৪]
>
> খ. **যারা** মরিয়া গিয়াছে **তারা** রক্ষা পাইয়াছে। **যারা** বাঁচিয়া আছে **তারা** শুধু ভাবিতেছে, আর কতদূর।[৪৫]

গ. এরা যেদিন মাসীর মতই তাকে পর করিয়া দিবে সেদিন সে কাথায় য়াইবে।[৪৬]

ঘ. বার বার ইচ্ছা করিল তার সাদা কাপড়ের আঁচল দিয়া তাদের দায়ে ছায়া দেয়।[৪৭]

ঙ. যার ঘরে নিত্য নিরানন্দ আনন্দাবসানের দুঃখের আঁধারে সে-ঘরে দুলিয়া উঠে না।[৪৮]

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, বহু বাংলা উপন্যাসেই সাধু ও চলিত গদ্য রীতির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। 'তিতাস'। —এ এই মিশ্রণ হয়তো কিছুটা ব্যাপক।

অন্যান্য বাংলা উপন্যাসের মতো এ উপন্যাসেও তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, আঞ্চলিক শব্দ-সহ পেশাগত ও তিতাস-তীরের চাষীদের অনুষঙ্গগত নানা ধরনের শব্দের রয়েছে উপস্থাপনা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ যেন নিজের কথা বলতে গিয়েই সহজ-সরল ভঙ্গিতে নিজের চেনা জানা শব্দগুলোই ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। এ বিষয়টি পর্যালোচনাকালে দেখা যায়, সাধারণত প্রতি পৃষ্ঠায় আছে পাঁচ থেকে ছয় শ শব্দ। তাতে মেলে একাধিক তৎসম শব্দ। প্রতিটি অংশ থেকে কয়েকটি তৎসম শব্দের উদাহরণ দেয়া যায় :

১ম অংশ, পৃষ্ঠা ৪ নদী, প্রাণ, পণ্ডিত, পাহাড়।

২য় অংশ, পৃষ্ঠা ৩৮ দুঃখ, বিস্ময়, আনন্দ, দৃষ্টি।

৩য় অংশ, পৃষ্ঠা ৮১ ঋতু, সৃষ্টি, বুদ্ধি, আকাশ, জল, সন্ধ্যা।

৪র্থ অংশ, পৃষ্ঠা ১৩৩ বন্ধ, লজ্জা, মসৃণ, অত্যন্ত, ব্যথা ইত্যাদি।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ কখনও অপ্রচলিত তৎসম শব্দ ব্যবহার করেন নি। এখানে ব্যবহৃত প্রায় প্রতিটি শব্দই বিভিন্ন বাংলা গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধে বার বার ব্যবহৃত। ফলে তাঁর রচনা হয়েছে সাধারণভাবে সুখপাঠ্য ও সাবলীল। তাঁর উপন্যাসে বোধগম্য শব্দ ভাণ্ডারের সঙ্গে রয়েছে পেশাগত শব্দাবলী উপস্থাপনা। তিতাস-তীরের মুসলমান চাষীদের অনুসঙ্গে এসেছে নানা শব্দ। যেমন, আল্লাহ গজব, ফজর, কেরায়া, দেওয়ানা, বেহুদা, কিসিম ইত্যাদি। এ উপন্যাসের বহু সংলাপে আঞ্চলিক শব্দাবলি ব্যবহৃত হয়েছে ব্যাপকভাবে। আমাদের ব্যবহৃত গ্রন্থটির চারটি পর্ব থেকে চারটি পৃষ্ঠা পর্যালোচনা করে কতগুলো আঞ্চলিক শব্দ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। যেমন, জালুয়া > জেলে, ছাইলা > ছেলে, পসসাদ > প্রসাদ, ঢাইল্যা > ঢেলে, দিমু > দেবো, ভইন > বোন প্রভৃতি।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালোদের জীবন সংগ্রামকে রূপায়িত করতে গিয়ে সংলাপে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের কারণে তা হয়েছে বাস্তবতা-নির্ভর। উপন্যাসের প্রথম পর্যায় থেকে শেষ অবধি ঘটনা বিন্যাসে ব্যবহৃত বহু আঞ্চলিক শব্দের সমন্বয়ে সৃষ্ট বাক্যসমূহ সৃষ্টি করেছে নানা বৈচিত্র্য। এ বৈচিত্র্য যেন ভারসাম্য রচনা করেছে তিতাসের জল ও জীবন প্রবাহের মধ্যে। তবে, লেখক পারতপক্ষে দুর্বোধ্য আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেন নি। এ উপন্যাসে যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে সাধু ও চলিত মিশ্রিত রীতিতে তৈরী সংলাপ। এর মধ্য দিয়ে মালোদের ভাষা বৈশিষ্ট্য হয়েছে উপস্থাপিত। বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষ সাধু-চলিত রীতি মিশ্রিত আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহার করে থাকে। সাধু ও কথ্য তথা আঞ্চলিক রীতির মিশ্রণে সৃষ্ট কয়েকটি সংলাপের উদাহরণ এ প্রসঙ্গে উপস্থাপিত হলো :

> ক. এমন টালাইন্যা গিরস্তি কতদিন চালাইবা। নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা! এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ। স্মরণ হয় না কেন? [৪৯]
>
> খ. রাঁড়িরে শেষ খাওন খাওয়াইয়া দেই, আর ত কোনদিন খাইতে আইব না।[৫০]
>
> গ. মাতবরের ছেলে, ডাক দিলে না, কোন্ সময়ে আসিয়াছ জানিলাম না। শীতে কষ্ট পাইলে।[৫১]
>
> ঘ. ঠাকুর সকল, ঘরে নি আছ, আমার একখান কথা। ভারতের বাড়িতে আজ দশজনের সভা। তোমরার নিমন্ত্রণ। পান তামুক খাইবা, দশজনের কথা শুনবা।[৫২]
>
> ঙ. আমারও দিদি সময় সময় মন অচল হইয়া পড়ে। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা কইরা রাখছি, এই ভাবেই চালামু।[৫৩]

ভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে উপমা-চিত্রকল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার মাধ্যমে বক্তব্যকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি সম্ভব হয়। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে রয়েছে অনেক সার্থক ও সঙ্গতিপূর্ণ উপমা। যেমন :

> ক. তিতাস নদী এখানে ধনুর মত বাঁকিয়াছে।[৫৪]
>
> খ. গুনটানা নৌকার মত বনমালী অনন্তর হাত ধরিয়া টানিয়া চলিয়াছে।[৫৫]

গ. মেয়েটার খোঁপা খুলিয়া গিয়া শাপের মত লম্বা চুল মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে।[৫৬]

ঘ. এক মুহূর্ত আগে তার নৌকা ময়ূরের মত বৈঠার পেখম উড়াইয়া সর্পির গতিতে চলিতেছিল।[৫৭]

ঙ. স্বপ্নের মত অভাবিত এই জল।[৫৮]

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে অসংখ্য বাগধারা বা প্রবাদ-প্রবচন। এ গুলোর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তিতাস-তীরবর্তী মানুষের মনোভঙ্গি, বিশ্বাস-সংস্কার-উপলব্ধি ও তাদের জীবন-অভিজ্ঞতা। উপন্যাসে ব্যবহৃত এ সব প্রবাদ-প্রবচন ফুটিয়ে তুলেছে মালোদের লোকজ অভিজ্ঞতা ও বৈশিষ্ট্য। উপন্যাস থেকে কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যায় : কাকের মুখে সিন্দুইরা আম; তবে ঘটে দেও বেলপাতা; মা মরলে বাপ তালই/ভাই বনের পশু; ধানের মধ্যে খামা/কুটুমের মধ্যে মামা; শিবের মতন চোখ; আ-ঘাটাতে চন্দ্র উদয়; চৌদ্দ-সানকির তলা প্রভৃতি। এ সব বাগধারা বা প্রবাদ-প্রবচন সংগ্রহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে অদ্বৈত মল্লবর্মণ বাংলা উপন্যাস সাহিত্য তথা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

উপন্যাসটিতে ব্যবহৃত ভাষা লেখকের নিজ অভিজ্ঞতা থেকে সংগৃহীত এবং সে-ভাষা তিতাস-তীরবর্তী জন-জীবন উপস্থাপনের তাগিদে ব্যবহৃত। শুদু সংলাপ নির্মাণের ক্ষেত্রেই নয়, উপন্যাসটির বর্ণনা অংশেও রয়েছে বহু লোকজ শব্দের উপস্তিতি। যেমন : চৌয়ারি তকলি, টেকা, তাগা, বোপা, ছেউ, চরকি, খেউ, পুলা, খলা, বাওয়া ইত্যাদি।

'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে লেখক প্রয়োজন মতো অনুপ্রাস, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত ব্যবহার করেছেন। সেগুলোর মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে অর্থ ব্যঞ্জনা। সোঁসোঁ, হু হু, থৈ থৈ, চিকচিক, ছম ছম, হিস্ হিস্ প্রভৃতির ব্যবহার এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। দিরুক্ত বা শব্দদ্বৈত ব্যবহার বাক্যের শ্রুতি বা ধ্বনি মাধুর্য এবং অর্থের গৌরব বৃদ্ধি করে। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে বহু যতোপযুক্ত শব্দদ্বৈত ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক বাক্যের ধ্বনি-মাধুর্য ও অর্থ-গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। যেমন, সুন্দর সুন্দর, ঝলকে ঝলকে, বনে বনে, মনে মনে, ক্ষণে ক্ষণে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে প্রভৃতি। এ ছাড়া বহু মনোহর অনুপ্রাস ব্যবহারেও তিনি পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। এ সবের মাধ্যমে ভাষা অনেক স্থানে হয়েছে ঐশ্বর্যময়।

আগেই বলা হয়েছে যে, 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের ভাষা সাধু ও চলিত রীতি মিশ্রিত। বহু তৎসম, তদ্ভব, দেশী, বিদেশী ও আহইলক শব্দে সমৃদ্ধ এ উপন্যাসের গদ্য শৈলী। এ ছাড়া উপমা, উৎপ্রেক্ষা চিত্রকল্প, অনুপ্রাস, ধ্বন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, বিশেষণ, বচন-প্রবচন প্রভৃতি ব্যবহার করে ঔপন্যাসিক এ গ্রন্থের ভাষায় শিল্পসম্মত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। এ ক্ষেত্রে অদ্বৈত মল্লবর্মণের বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত জীবনবোধ বিশেষ সহায়ক হয়েছে। তাঁর রচনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আন্তরিকতার সঙ্গে নির্মোহ মাসিকতার সমন্বয়। এবং সে-কারণেই এ উপন্যাসের ভাষা শৈলী লাভ করেছে উল্লেখযোগ্য শিল্পসম্মত রূপ। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> তিতাসের স্রোতের মতোই ভাষাতেও এসেছে একটা মৃদু সঙ্গী— যা জীবনের মৃদু এবং মেদুর, সুখ এবং দুঃখ ধ্বনিত করেছে অসীম নীলাকাশের অঙ্কশায়ী নদীর অস্পষ্ট এবং চিরন্তন তরঙ্গ কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।[৫৯]

একজন লেখকের জীবন দর্শনের প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পড়ে তাঁর রচনায়। উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ ও বর্ণনা অংশে এ প্রভাব নানাভাবে ক্রিয়াশীল থাকে। যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশে তাঁর জন্ম ও বিকাশ ঘটে, সাধারণত তার সঙ্গে সমন্বয় বা সংঘর্ষ ঘটে তাঁর অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা ও অনুধাবনের। লেখকের জীবনবোধ বা জীবনাদর্শ গড়ে ওঠে তাঁর পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। ঔপন্যাসিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তাঁর অভিজ্ঞতালব্দ বাস্তবতার ভিত্তিতেই 'তিতাস একটি নদীর নাম' রচনা করেছেন। ফলে, সেখানে তাঁর জীবন-ভাবনার প্রভাব পড়েছে। তিতাস-তীরবর্তী নর-নারীদের পরিশ্রম ও সংগ্রাম, আশা-হতাশা সব কিছুরই ভাগীদার অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তাদের জীবনের নগ্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে আন্তরিকভাবে ছিলেন তিনি পরিচিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের জন্যে লড়াই করতে বা তাদের সহায়তা করতে সম্মত ছিলেন না তিনি। কিছুটা অন্তর্মুখী এই মানুষটি এক রকম পালিয়ে যান কলকাতায়। বস্তুত, গণমানুষের নেতা হওয়ার গুণ বা আগ্রহ তাঁর মধ্যে জন্মায় নি। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> মালোরা যে অদ্বৈতকে চাঁদা তুলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পড়তে পাঠিয়েছিল তাতে ছিল তাদের বন্দী জীবন থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা। অদ্বৈত যদি লেখাপড়া শিখতে পারে তাহলে তমসুখের খত

> বা বেপারীর হিসাব লেখাতে তাদের আর কারো পা ধরতে হবে না। বেপারীর হিসাব বা তমসুখের খত এমনিতেই তাদের জীবনকে পঙ্গু ও বিপন্ন করে রেখেছে। তার ওপর যদি ঐ হিসাবের মধ্যে ভুল তথ্য বা গোঁজামিল থাকে তাহলে তাদের বাঁচার ন্যূনতম পথও বন্ধ হয়ে যায়। সে জন্য অদ্বৈতের লেখাপড়া করার মধ্যে গোকর্ণের মালোরা তাদের ন্যূনতম অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিল।[৬০]

উচ্চবর্ণ ও উচ্চবিত্ত কর্তৃক তাঁর পূর্ব পুরুষদের শোষণ-বঞ্চনার শিকার যেন লেখক নিজেও। তাঁর অঙ্কিত মালোদের শোষণ-বঞ্চনার চিত্রের মাধ্যমে সে সময়কার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, শৈক্ষিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির পরিচয় মেলে। বাল্যকালেই লেখকের বাবা-মা মারা যান। তখন কোনভাবে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টাকালে মানুষের কাছে তিনি অনাদর-অবহেলা পেয়েছেন। তবে, তিনি সব সময়ই সকল বৈরী পরিস্থিতিতে আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে নিজেকে সামলে নিতেন। এ বিষয়টির উল্লেখ করেছেন একজন সমালোচক :

> বরং অদ্বৈত এ সময়ে যে অনাদর, অবহেলা ও অপমান পেয়েছেন তা থেকেই প্রত্যক্ষভাবে দৃঢ়তা ও তার পরিণতিতে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলেন।[৬১]

মেধাবী ছাত্র অদ্বৈত। মাইন পাস করেন বৃত্তি নিয়ে। পরবর্তীতে অন্নদা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ১৯৩৩ সালে পাস করেন প্রথম বিভাগে। আর্থিক অনটনের জন্য আরও ভালভাবে পড়াশোনা করতে পারেন নি বলে তিনি পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ার মতো নম্বর পেতে ব্যর্থ হন। প্রধানত মুসলমান ছাত্ররা পড়তো যে 'জর্জ স্কুলে', সে-স্কুলের 'সবুজ' পত্রিকার সম্পাদক অদ্বৈতর সতীর্থ শাহ্ আফতাবউদ্দীন তাঁকে এ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত করেন। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'তিতাস' নামের কবিতাটি। সে সময়ের অদ্বৈত সম্পর্কে স্মৃতিচারণে 'সবুজ'-সম্পাদক শাহ আফতাবউদ্দীন বলেছেন :

> কবিতাটি মাইকেলের 'কপোতাক্ষ নদ'-এর আঙ্গিক ও প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দিলেও প্রবহমান তিতাস ও তার তীরের জনপদের যে বাস্তব বর্ণনা ঐ কবিতায় ছিল তাতে ঐ বয়সেই আমাদের মনে হয়েছিল 'অদ্বৈত আমাদের কবি'। কবিতাটি শুধু নৈসর্গিক সৌন্দর্যের কথা বলে নি, বলেছে শোষিত মালোদের কথাও।[৬২]

কৈশোর থেকেই অদ্বৈত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েন এবং নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে হয়ে ওঠেন সচেতন। তখন তিনি জারিগান দলের 'গানদার' বা 'খলিফা' বলে পরিচিত পেয়েছিলেন। এ গানের সুবাদে তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে আসা-যাওয়া করতেন। এর মাধ্যমেই অদ্বৈত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পান। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> .....এভাবেই অদ্বৈতের মনোজগতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নিম্নবর্গের খেটে খাওয়া মানুষের সংস্কৃতির গাঢ় রং লাগিয়েছে।[৬৩]

অর্থ কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হয় অদ্বৈতের মনে। প্রথম বর্ষে পড়ার সময় 'সন্তান' প্রেসের মালিক জিতু দত্তের পরামর্শে (১৯৩৪) কলকাতায় এসে 'ত্রিপুরা' পত্রিকায় অদ্বৈত শুরু করেন কর্মজীবন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশ বছরের জীবনের (১৯১৪—১৯৩৪) অসংখ্য ঘটনার স্মৃতি বিচলিত করেছে কলকাতাবাসী অদ্বৈতকে। সে-কালের সমাজ-বাস্তবতায়, শোষণের জালে আবদ্ধ মালোদের জীবনসংগ্রাম ও জীবনযন্ত্রণাই যেন রচনা করেছিল অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনবোধ। নিজ অস্তিত্বের সঙ্গে যেন জড়িয়ে ছিলো তাঁর পরিচিত মানুষগুলোর জীবনের দুঃখভরা গান। তাদের প্রতি তাঁর গভীর দরদ জাগ্রত ছিলো তাঁর মৃত্যু-অবধি। তিনি শোষিতদের মুক্তির কথা ভেবেছিলেন বৃহত্তর পটভূমিতে। এর প্রমাণ মেলে 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত অদ্বৈতের লেখা কবিতায়। ব্রিটিশ-বিরোধীদের সঙ্গে অদ্বৈতর সম্পর্ক হয় অনুশীলনী ক্লাশে। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রক্তনিশান' নামের চারটি কবিতায় ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর এই মনোভাব। তাঁর সাম্রাজ্যবাদ তথা ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের জন্যেই 'মোহাম্মদী' পত্রিকার চাকুরি হারাতে হয়েছিল তাঁকে। শৈশব থেকেই দুঃখকষ্ট ছিল তাঁর জীবনের সঙ্গী। কিন্তু, সে-কারণে তিনি কারও প্রতি নিষ্ঠুর হতে শেখেন নি। বরং অধিকতর কোমল ও মানবিক মন নিয়ে আরও ব্যাকুল হয়েছেন নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের দুঃখ-দুর্দশায়। এবং সে-কারণেই অকৃত্রিম দরদে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আচার-আচরণ, কৃষ্টি-সংস্কৃতির চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। মালোদের জীবন তিতাস-নির্ভর। এবং সে-বাস্তবতা অনুধাবন করেই তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খণ্ড খণ্ড ছবির সমন্বয়ে তিতাস-তীরবর্তী জনমানুষের জীবনচিত্র লেখক তুলে ধরেছেন নিজ দক্ষতায়।

এ উপন্যাসে উপস্থাপিত প্রধান পাত্র-পাত্রীরা নিম্নবর্গের হিন্দু। এ ছাড়া রয়েছে অবস্থাপন্ন মুসলমান পরিবারের কথা। তিতাস পাড়ের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়গত পার্থক্য যতই থাক, মনের দিক থেকে তারা ছিল একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল। পক্ষান্তরে, উচ্চবর্গের হিন্দুরা নিম্নবর্গের হিন্দুদের মনের প্রান্তে ঠাঁই দেয় নি, শুধু তাদের শোষণই করেছে। লেখকের মন থেকে সমবেদনা উৎসারিত হয়েছে এ সব বিত্তহীন নিম্ন শ্রেণীর মানুষের প্রতি। নদীকে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেছেন দরিদ্র হিন্দু-মুসলমান জনগোষ্ঠীর সহানুভূতি-সমবেদনার মিলন মেলা হিসেবে। এবং এটি দেখা যায় নানা ঘটনার মাধ্যমে, বিশেষ করে বনমালী ও ধনঞ্জয়ের কাদিরের প্রায়-ডুবে-যাওয়া আলুর নৌকা উদ্ধারের চিত্রের মধ্য দিয়ে।

নদীকে তিতাস-তীরবাসীদের শুধু মিলনস্থান ও জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে বলেই রূপায়িত করেন নি লেখক। নদীর মাধ্যমে এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলোর জীবন উপলব্ধিও ঘটেছে। কিশোর, সুবল, বাসন্তী, অনন্তর মা সকলেরই জীবনের গতি যেন নিয়ন্ত্রণ করেছে নদী। কিশোর, সুবল, বাসন্তী তিন জনের মধ্যে একমাত্র বাসন্তী উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত থেকেছে ক্রিয়াশীল, প্রত্যক্ষ করেছে সে মালোদের প্রায়-ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে। কিশোরের জীবন-উপলব্ধির ক্ষেত্রেও নদী সক্রিয়, তেমনি কিশোরের পাগল হওয়ার কারণও যেন নদী। সুবল মারা গেছে নদীতে সংঘটিত এক দুর্ঘটনায়। সুবলের অপমৃত্যু বাসন্তীকে করেছে বিধবা। বাসন্তীর দুঃখের কারণও তাই নদী। অনন্তর মায়ের জীবনের অপরিসীম দুঃখের মূলেও রয়েছে নদীর ভূমিকা। উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলোও কম বেশি। নিয়ন্ত্রিত নদী দ্বারা। তিতাস ইতঃপূর্বে কখনও এমন সর্বগ্রাসী ছিল না, সে সকলকে দিয়েছে নির্ভরতা, প্রশান্তির আশ্রয়। তার ভিত্তিতেই তার তীরে টিকে ছিলো একটি জনগোষ্ঠী নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ করেই পরিবর্তন ঘটে তিতাসের স্রোতোধারায়; ফলে মালোদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। অর্থ সংকটে, তীব্র অভাবের মুখে মালোদের জীবনে নেমে আসে বিপর্যয়। তাদের এ ধ্বংসকে আরও ত্বরান্বিত করে সংস্কৃতির পরিবর্তন। মালোদের একাংশ নিজস্ব সংস্কৃতিতে প্রকাশ করতে থাকে অনীহা, তারা বাইরের চটুল অপসংস্কৃতিতে হয় মোহাচ্ছন্ন। ফলে মালোদের সংহতিতে ধরে ফাটল এবং তখনই যেন চূড়ান্ত হয় তাদের ধ্বংস। লেখক এ গ্রন্থে তাঁর চারপাশের মানুষের বিপর্যস্ত-যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনের চিত্রই করেছেন বাণীবদ্ধ। বলা যায়, 'যাপিত জীবনের কোন লেখক-শিল্পী যখন তাঁর নিজ জীবন বা তাঁর জনগোষ্ঠীর জীবনের চিত্র আঁকেন, তখন তা হয়-অনবদ্য, অনন্য।[৬৪]

বস্তুত, মানব-দরদের মোড়কেই যেন সাজানো অদ্বৈতের মানসলোক, গভীর মানব কল্যাণের আকাঙ্ক্ষায় গঠিত অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবনবোধ থেকে উৎসারিত বহু ঘটনা চিত্রের সমন্বয়ে রচিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রকৃত অর্থে মানুষের প্রতি তাঁর নিঃশর্ত ভালোবাসার প্রতীক। ফলে, উপন্যাসটির শিল্পরূপও পেয়েছে সৃষ্টি-সফলতা।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১। দেবেশ রায়, উপন্যাস নিয়ে, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১১৭

২। অচিন্ত্য বিশ্বাস, অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তিতাস একটি নদীর নাম, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৩০-৩১

৩। ঐ, পৃ. ৩৬

৪। ঐ, পৃ. ১৩৯

৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৭৬৭

৬। ঐ, পৃদ ৭৬৮

৭। শান্তনু কায়সার, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ: জীবন, সাহিত্য ও অন্যান্য,* কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৫৭

৮। Percy Lubbock. *The Craft of Fiction,* London, 1968, P. 40.

৯। অচিন্ত বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩ (ভূমিকা)

১০। ঐ, পৃ. ৩৮

১১। ঐ, পৃ. ৪০

১২। ঐ, পৃ. ৩৯

১৩। ঐ, প. ৯৫

১৪। ঐ, পৃ. ১০১

১৫। ঐ, পৃ. ১৭৯ (ভূমিকা)

১৬। শান্তনু কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

১৭। অচিন্ত্য বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৩

১৮। ঐ, পৃ. ১৮২ (ভূমিকা)

১৯। ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

২০। ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭ (ভূমিকা)

২১। ঐ, পৃ. ৮৪

২২। ঐ, পৃ. ১২৪

২৩। ঐ, পৃ. ১২৪

২৪। ঐ, পৃ. ১৪৯
২৫। ঐ, পৃ. ১৫৫
২৬। ঐ, পৃ. ১৩
২৭। ঐ, পৃ. ১৫৬
২৮। ঐ, পৃ. ১৫৭ (ভূমিকা)
২৯। ঐ, পৃ. ১৪০
৩০। ঐ, পৃ. ১৫৯ (ভূমিকা)
৩১। ঐ, (ভূমিকা) পৃ. ১৫২
৩২। ঐ ১, পৃ. ৭২
৩৩। ঐ, পৃ. ১২৫
৩৪। ঐ, পৃ. ১৩০
৩৫। ঐ, পৃ. ১৩৭
৩৬। ঐ, পৃ. ১৬৫
৩৭। গিয়াস শামীম, বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২৬
৩৮। অচিন্ত্য বিশ্বাস, ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩
৩৯। J.A. Cuddon, The penguim Dictimary of dLiterary Terms and Literary Theory, Lioneou, 1992, P. 782
৪০। অচিন্ত্য বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬
৪১। ঐ, পৃ. ৩৫
৪২। ঐ, পৃ. ৫১
৪৩। গিয়াস শামীম, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
৪৪। অচিন্ত্য বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
৪৫। ঐ, পৃ. ১৫৪
৪৬। ঐ, পৃ. ১১৩
৪৭। ঐ, পৃ. ৪১
৪৮। ঐ, পৃ. ৬৫।
৪৯। ঐ, পৃ. ১৩
৫০। ঐ, পৃ. ৯১
৫১। ঐ, পৃ. ৫৫
৫২। ঐ, পৃ. ৪৭
৫৩। ঐ, পৃ. ৭৪
৫৪। ঐ, পৃ. ৮০

৫৫। ঐ, পৃ. ৮৭

৫৬। ঐ, পৃ. ৭৮

৫৭। ঐ, পৃ. ১৩৫

৫৮। ঐ, পৃ. ১৫০

৫৯। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৮৭

৬০। শান্তনু কায়সার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১, ২

৬১। শান্তনু কায়সার, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, ঢাকা, পৃ. ২

৬২। ঐ, পৃ. ৩

৬৩। অচিন্ত বিশ্বাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৬৪। তিতাশ চৌধুরী, অদ্বৈত বল্লবর্মণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ , ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৭